বুকের মধ্যে আগুন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ এক ॥

রাত প্রায় এগারোটা। দূর পাল্লার ট্রেনটি তখন রীতিমত জোরে ছুটছে। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে আর কোন স্টেশনে থামবে না। ফার্স্ট ক্লাসে-সেকেন্ড ক্লাস কামরাগুলোতে বেশির ভাগ আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে যাত্রীরা। থার্ড ক্লাস কামরায় আলো নেভে না, সেখানেও যাত্রীরা ঘুমে ঢুলছে। অনেকেই শোয়ার জায়গা পায় নি, এ ওর ঘাড়ে মাথা রেখেছে।

একটি কামরায় চার পাঁচ জন যুবক এক কোণে বসে তাস খেলছিল। সাধারণত তাস খেলার সময় খবু চেঁচামেচি হয়। যুবা বয়সের ছেলেরা অন্যদের সুবিধে অসুবিধে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু এরা তাস খেলছে প্রায় নিঃশব্দে। ব্রীজ খেলা। ডাকার সময় এরা কথা বলছে মৃদু গলায়, তারপর আবার চুপচাপ। মাঝে মাঝেই এরা খেলা থামিয়ে তাকাচ্ছে। পরস্পরের চোখের দিকে, কিংবা ঘড়ি দেখেছে।

ট্রেনটির শেষ গার্ডের কামরার গার্ডবাবু বসে বসে একটা গল্পের বই পড়ছেন। তিনি পাঁচ কড়িদে'র লেখা গোয়ান্দা কাহিনী পড়তে খুব ভালোবাসেন।

ব্রেক ভ্যানে রাইফেলধারী রক্ষী মেঝেতে বসে আছে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে। মাঝে মাঝে তার চোখ বুজে আসছে, আবার গা ঝাড়া দিয়ে ঠিকঠাক হয়ে বসছে।

ইঞ্জিনে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ড্রাইভার তার দু'জন সহকারীর সঙ্গে গল্প-গুজবে ব্যস্ত। তার প্যান্টের পকেট থেকে উঁকি মারছে একটা মদের বোতল। বোতলটির ভিতরের জিনিস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আর দু'এক চুমুক বাকি। সবাই জানে ইঞ্জিনের ড্রাইভার ফার্গুসন দু'তিন বোতল খেয়েও একটু টলে না।

এক সময় ট্রেনের গতি হঠাৎ মন্থর হয়ে এলো। কাছাকাছি কোনো স্টেশন নেই, এখানে ট্রেন থামার কথা নয়। দু'বার শোনা গেল তীব্র হুইশল্।

যে যুবকেরা তাস খেলছিল, তারা এক সঙ্গে হাতের তাসগুলো ফেলে দিল। চোখের ইশারা করে তারা উঠে পড়ে এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে। কামরার অধিকাংশ যাত্রীরা এখনো ঘুম ভাঙে নি।

দু'একজন ঘুম-কাতর চোখে জানালা দিয়ে তাকালো বাইরে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কোথাও একটু আলো বা মানুষজনের চিহ্ন নেই। অন্ধকার চোখে একটু সয়ে গেলে মনে হয় দূরে একটা বিল বা জলাশয় রয়েছে। আর একপাশে জঙ্গল। এখানে ট্রেন থামার মানে কি?

সে সময় দেখা গেল, ফিরিওয়ালা-হকাররা যেমন চলন্ত ট্রেনের এক কামড়া থেকে অন্য কামরায় যাতায়াত করে, সেই রকম কয়েকজন খাঁকি প্যান্ট-সাদা শার্ট পরা যুবক অবলীলাক্রমে চলাচল করতে শুরু করেছে। তাদের পায়ে কেডস্ জুতো।

ইঞ্জিনের দু'দিকের দরজা দিয়ে দু'জন যুবক ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তাদের হাতে লম্বা ধরনের পিস্তল। সেই পিস্তল উঁকিয়ে তারা ইংরেজিতে বলল, ট্রেনের গতি ধীর করে দাও, একেবারে থামবার দরকার নেই। আমার কথার অবাধ্য হয়ে আমাদের গুলি করতে বাধ্য করো না।

ইঞ্জিন ড্রাইভার ফার্ন্ডসন বিরক্তভাবে বললো, এটা কি ছেলেখেলা হচ্ছে?

একজন যুবক তার কানের কাছে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে বললো, আর একটাও কথা শুনতে চাই না। যা বলছি কারো!

ড্রাইভারের সহকারী একজন ষোলো- সতেরো বছরের ছেলে।

সে হঠাৎ দু'বার বিপদ- সংকেত ধ্বনি বাজিয়ে দিল। তখন যুবক প্রচন্ড এক ঘুষি কষালো তার মুখে। ফান্ডসন আর বাক্যব্যয় না করে গতি কমাতে লাগলো গাড়ির। এক সময় সে থামিয়ে দিল ট্রেন।

পিস্তলধারি যুবকটি বললো, গাড়ি একেবারে থামাতে বারণ করলুম না?

ফার্ন্ডসন বললো, তোমার চালাতে ইচ্ছে হয়, তুমি চালাও। আমি আর পারছি না! অন্য যুবকটি বললো, ঠিক আছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। কোনো রকম চালাকি করার চেষ্টা করো না!

গাড়ি থেমে যেতেই আট দশটা ছেলে টপাটপ্ নেমে দাঁড়ালো। তারা সবাই সশস্ত্র।

যুবকেরা তিন চারটে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো ট্রেনের সামনে ও পিছনের দিকে। একটু দূরত্ব রেখে তারা পাহারা দেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়লো। এখনো তারা নিঃশব্দ।

গার্ডবাবুর হাত থেকে বইখানা খসে-পড়ে গেছে। তিনিও তখনও বুঝতে পারছেন না যে তিনি স্বপ্ন দেখছেন না এটা সত্যি! সত্যিই তাঁর সামনে তিনজন ডাকাত দাঁড়িয়ে আছে? তিনি যে বইটা পড়ছিলেন, তাতেও হুবহু এরকম একটা ট্রেন ডাকাতির ঘটনা আছে। তাঁরা চাকরি হয়ে গেল চব্বিশ বছর -কখনো এরকম ঘটনা ঘটে নি।

গার্ডবাবু কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আমাকে প্রাণে মারবেন না, আমার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে----

অস্ত্রধারী যুবকদের মধ্যে যার বয়সে সবচেয়ে বেশী, অর্থাৎ তিরিশ বত্রিশ, মুখে গোঁফ, সে গম্ভীর গলায় বললো, আপনাকে প্রাণে মারার আমাদের একটুও ইচ্ছে নেই। আমরা যা বলছি শুনুন।

গার্ডবাবু হাত জোড় করে বললেন বলুন!

-ব্রেক ভ্যানে চলুন। আমাদের বাক্সগুলো চিনিয়ে দেবেন।

- কিসের বাক্স?

- যাতে সরকারি টাকা আছে।

- সে রকম তো কোনো বাক্স নেই। ইয়ে, মানে সব তো চিঠিপত্র আর মালপত্র।

-আপনার বউকে বিধবা করতে চান?

- কি বললেন?

গোঁফওয়ালা যুবকটি এবার প্রচন্ড ধমক দিয়ে বললো, কানেও শুনতে পাচ্ছেন না! আপনি আপনার বউকে বিধবা করতে চান? আমরা খুব ভালোভাবেই জানি এই ট্রেনে টাকা আসছে।

- আপনারা কে?

- ডাকাত! সেটুকুও বোঝার মতো ক্ষমতা নেই?

আর একজন যুবক বললো, শুনুন, আমরা --------

গোঁফওয়ালা যুবকটি তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই বললো, আপনি ডাকাত-সর্দার অযোধ্যা -সিং এর নাম শোনেন কি? আমরা সেই দলের লোক। আমাদের সর্দার ইঞ্জিন ঘরে আছে। ভালো চান তো চলুন?

-ওরে বাবারে, আমার পা কাঁপছে। আমি হাঁটতে পারছি না!

-আমরা আপনাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি!

গোঁফওয়ালা যুবকটি আর একজনকে ইঙ্গিত করলো। সে অসুস্থ লোকটিকে হাঁটবার মতন ভঙ্গিতে গার্ডকে নিয়ে চললো।

খানিকটা দূর গিয়ে গার্ডবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। তার পরেই তিনি ডাকাতের হাত বাড়িয়ে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

গোঁফওয়ালা যুবকটি দৌড়ে এসে গার্ডবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে একটা লাথি মারার জন্য পা তুললেন।

গার্ডবাবু হাউমাউ করে কেঁদে বললেন, আমাকে মেরো না! আমাকে মেরো না। আমি ব্রাহ্মণ!

-ব্রাহ্মণ তো হঠাৎ এরকম চতুষ্পদ হলেন কেন?

- আমার চাকরি যাবে। আমি ধনে-প্রাণে মারা যাবো।

যুবকটি গার্ডবাবুর ঘাড় ধরে টেনে তুলে ধমক দিয়ে বললে, তা হলে কি এক্ষুণি মরতে চান?

ব্রেক ভ্যানে সশস্ত্র প্রহরীটির হাত মুখ বাঁধা। তার রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে দু'জন যুবক তাকে পাহারা দিচ্ছে। গার্ড নিয়ে সদলবলে গোঁফওয়ালা যুবকটি ঢুকলো। সেখানে অনেকগুলো বাক্স ও নানা রকম প্যাকেট।

গোঁফওয়ালা যুবকটি গার্ডকে বললো, কোন্‌টা কোনটা দেখিয়ে দিন।

- আমি জানি না, সত্যি জানি না।

-যুবকটি পিস্তল তুলে বললো, এক--- দুই----------

- মারবেন না, আমাকে মারবেন না।

-অযোগ্য সিং-এর দল কখনো বাজে সময় নষ্ট করে না!

- আমার চাকরি যাবে! আমি ধনে-প্রাণে মারা যাবো!

- ল আপনার চাকরি যাবে না। আপনারও হাত-মুখ বেঁধে রেখে যাবো আমরা।

- ঐ যে, ঐ বাক্সটা।

- চাবি কোথায়?

–চাবি আমার কাছে থাকে না। বিশ্বাস করুন।

দু'জন যুবক এসে দু'দিকে থেকে গার্ডবাবুকে চেপে ধরে তার কোট আর শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। এক গোছা চাবি বেরুলো। কিন্তু কোনো চাবিই বাক্সটাতে লাগে না। যুবকরা তাড়াহুড়ো করে ঠিক মতন লাগাতে পারছে না।

- কোন্‌ চাবিটা? শিগগির বলুন।

- এর মধ্যে নেই। সত্যি নেই।

–ধুত্তোরি ছাই!

একজন বিরক্তিতে চাবিগুলো ফেলে দিল মেঝেতে।

অনেক যাত্রী তখনও ঘুমাচ্ছে। কেউ কেউ স্বপ্ন দেখছে। কেউ কেউ অবশ্য ঘুম ভেঙে জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে জানতে চাইছে ব্যাপারটা কি?

হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে একটা পিস্তলের গুলির শব্দ শোনা গেল। তারপরই অনেকের ছোটাছুটির আওয়াজ।

ফার্স্ট ক্লাস বগির একটা কুপেতে এক ইংরেজ দম্পতি জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছিল। সাহেবটিরই আগে ঘুম ভাঙলো। স্ত্রীর আলিঙ্গন ছাড়িয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালালো, তারপর মুখ বাড়ালো জানালা দিয়ে।

মেমটি চোখ মেলে বললো, ডার্লিং আলো জ্বালালো কেন?

সাহেবটি বললো, সামথিং ইজ হ্যাপেনিং আউট–সাইড!

-আলো নিভিয়ে দাও! কেউ যদি জানালা দিয়ে দেখে?

মেমসাহেবটি একটি পাতলা কাপড়ের সেমিজ পরে আছে শুধু। তার ভেতর দিয়ে তার সর্বাঙ্গ পরিষ্কার দেখা যায়। ভারতবর্ষের অসহ্য গরমের রাত- এ ছাড়া আর কি পোশাক পরা যায়।

মেমসাহেবটি ঘ্যানঘেনে গলায় বললো, আলো নিভিয়ে দাও! প্লিজ!

সাহেবটি বাইরের গোলমাল কিছুটা অনুভব করেছে। সে মুখ না ফিরিয়ে গম্ভীর গলায় বললো, গেট ড্রেসড!

- হোয়াই?

সাহবটি জানালা থেকে ফিরে এসে বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা বের করলো। তারপর বললো, মনে হচ্ছে হোল্ড আপ। গাড়িতে ডাকাত পড়েছে।

মেমসাহেবটি এতে বেশ আমোদ পেয়ে বললো, রিয়েলি? আই মাস্ট সী দেম? আমি কখনো ডাকাতি দেখি নি!

দু'জনেই জানালার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। কয়েকটা ছায়ামূর্তি এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছিল। কাছাকাছি একজনকে দেখে সাহেবটি রাজকীয় মেজাজে জিজ্ঞেস করলো, হেই, হোয়াট্ হ্যাপিং দেয়ার?

একটা চ্যাংড়া মতন ছেলের গলায় উত্তর এলো, শাট্ আপ!

সাহেবটির মুখখানা লাল হয়ে গেল। সে স্ত্রীকে বললো, আমাকে নেমে দেখতে হচ্ছে।

মেম বললো খানা, এখান থেকে দেখো! তুমি তো এয়ার ফোর্সের স্টাফ, তুমি তো পুলিস নও!

আরও দুটি ছায়ামূর্তিকে দেখে সাহেবটি চমকে উঠে বললো, দে আর ক্যারিং গান্‌স!

-নেটিভরা এত গান্‌স পায় কি করে? রটন্ গভর্ণমেন্ট।

সাহেবটি বাইরের দুটি ছায়ামূর্তিকে চ্যালেঞ্জ করে বললো, স্টপ দেয়ার, হু আর ইউ?

আবার উত্তর এলো, শাট্ অ্যান্ড দা উউল্ডো।

সাহেবটি এবার আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলো না। গুলি চালালো। সঙ্গে সঙ্গে একটি যুবক মাটিতে পড়ে গেল আছড়ে। বিপরীত দিক থেকে পর পর দুটি গুলি ছুটে এলো ওদের দিকে।

মেমসাহেব ঠিক সময় মুখ সরিয়ে নিয়েছিল। একটা গুলি এসে লাগলো সাহেবটির মুঠো করে ধরা হাতে। পিস্তলটা খসে পড়ে গেল, রক্তে ভরে গেল হাত।

মেমসাহেব এক হ্যাঁচকা টানে স্বামীকে টেনে নিয়ে এলো ভেতরে। তারপর হাউমাউ করে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। ডাকাত দেখার শখ তার ঘুচে গেছে। নেটিভরা যখন তার স্বামীর দিকে গুলি চালাবার চেষ্টা করেছে। তখন ব্যাপার নিশ্চয়ই সাংঘাতিক। প্রাণের ভয়ে তার গলায় আওয়াজ বিশ্রী হয়ে গেল। ততক্ষণে বগির মধ্যে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। সাহেবের এক বন্ধু ধাক্কা দিচ্ছে তাদের কুপের দরজায়।

যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে গেছে সাহেবের। তবু দাঁতে দাঁত চেপে মেমসাহেবের প্রায় নগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললো, ড্যাম ইট! ইউ গেট ড্রেস্‌ড ফাস্ট! দেন ওপন দা ডোর!

এই সময় বাইরে থেকে কেউ একজন জোড়ালো গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, কেউ বাইরে বেরুবেন না। কেউ জানালা খুলবেন না! তাহলে কারোর কোন ভয় নেই।

সেকেন্ড ক্লাস কামরায় একজন নেপালী ভদ্রলোক ঘুম ভেঙে বসেছিলেন। লোকটি অসম-সাহসী। এক সময় বিলেতে ঘুর্খা রাইফেলসে ছিলেন, সদ্য রিটারার করেছেন। তিনি কামরায় অন্য লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, দো, চারঠো ডাকু! আপলোগ মেরা সাথ আইয়ে!

কেউ কোনো সাড়া শব্দ করলো না। সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে।

তিনি অবজ্ঞার সঙ্গে বিরক্তি মিশিয়ে বললেন, কয়েকটা ডাকু ভয় দেখাবে আর আমরা চুপ করে বসে থাকবো?

তাতেও কেউ কিছু না বলায় তিনি একাই উঠে দাঁড়ালেন।

বেল্ট সমেত সার্ভিস রিভলভার মাথায় কাছ স্যুটকেসের মধ্যে রাখা ছিল। সেটা দ্রুত বের করে নিয়ে তিনি কামরা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন নিচে।

কামরায় ভেতর থেকে কয়েকজন ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে বললেন, ও মশাই কি করছেন! শিগগির উঠে আসুন! ওদের কাছে বন্দুক আছে।

নেপালী ভদ্রলোক মুখে একটা। অসম-সাহসীর মতন তিনি উন্নত মস্তকে এগিয়ে গেলে কয়েক পা।

কাছাকাছি কেউ নেই। ইঞ্জিনের কাছে কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, ডাকু পাকড়না চাইয়ে। মরদ কই হ্যায় তো-

তার কথা শেষ হলো না, খুব কাছে অন্ধকারে একজন দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারের মধ্যে সে এমনভাবে মিশেছিল যে নেপালী ভদ্রলোক ওকে দেখতে পায় নি। ওর পাশ দিয়েই তিনি হেঁটে

এসেছেন। সে তৎক্ষণাৎ গুলি চালিয়ে নেপালী ভদ্রলোকের দেহ ফুঁড়ে দিল। তিনি কষ্ট না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন।

যে গুলি চালালো সে একটা রোগা পাতলা প্রায় বাচ্চা ছেলে!

বড় জোড় আঠারো- উনিশ বছর বয়েস, এক মাথা এলোমেলো চুল, বড় বড় টানা চোখ, ফর্সা রং। গুলি চালবার পর সে একটু পাগল-পাগল ব্যবহার করতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত সে ভ্যাবচ্যাক খেয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইলো। তারপরই নিজের হাতের পিস্তলটা ফেলে দিয়ে দৌড়ালো! কয়েক পা মাত্র গিয়েই ফিরে এলো আবার! নিচে হয়ে নেপালী ভদ্রলোকটিকে দেখলো সত্যি সত্যি মরে গেছে কিনা। এ আকস্মিক মৃত্যু সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। নেপালী ভদ্রলোকের মুখখানি খুব শান্ত, কোনো বিকৃতির চিহ্নমাত্র নেই। ঐ বাচ্চা ছেলেটি প্রথম গুলি চালিয়েই একজন লোককে মেরে ফেলেছে। হঠাৎ সে ভয় আর কান্না মেশানো একটা শব্দ করে উঠলো, তারপরই মুখ চেপে ধররো নিজের। এবার সে নিজের ও নেপালী নিজেরও নেপালী ভদ্রলোকটিকে রিভলভার দুটো কুড়িয়ে নিল মাটি থেকে। ততক্ষণে দূর থেকে তার কয়েকজন সঙ্গী ছুটে আসছে। দূর থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে রে, সুকুমার?

এই রোগা-পাতলা ছেলেটি, যার নাম সুকুমার, সে কিন্তু দাড়ালো না। আবার দুটো রিভলভার ফেলে দিয়ে তীর বেগে ছুটে গেল সামনের অন্ধকার মাঠের দিকে।

বিরাট লম্বা চওড়া চেহারার ইঞ্জিন ড্রাইভার ফার্ডর্সন রীতিমতন ঘামছে। বাইরে থেকে যে গুলির শব্দ আসছে তাতেও এখানকার পিস্তলধারী যুবক দুটির কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা জায়গা ছেড়ে এক পাও নড়েনি।

ফার্গুসন আর তার দু'জন সহকারীকে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কতক্ষণ এভাবে হাত তুলে রাখা যায়?

সে একটু নড়াচড়া করলেই যুবকরা তাকে ধমক দিচ্ছে। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে তার। ওদের হাতে পিস্তল না থাকলে ওদের মাথা দুটো গুড়ো করে দিতে তার এক মিনিটও লাগতো না। চঞ্চল চোখে সে এদিক ও দিক তাকাতে লাগল। ট্রেনের ইওরোপীয়ান প্যাসেঞ্জাররা কি করছে, তারাও কি সব ভয় পেয়ে গেল?

ফার্গুসন তার পকেটের মদের বোতলটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, এক চুমুক খেতে পারি? এটা ছাড়া আমি থাকতে পারি না।

তার কানের কাছে যে যুবকটি পিস্তল ধরে ছিল, সে একটু হাসলো। তারপর বললো, আচ্ছা খাও!

ফার্গুসন পকেট থেকে বোতলটা বের করে ধরলো মুখের সামনে। একবারেই সে সবটুকু গলায় ঢেলে দিল।

তারপর সে একটা কান্ড করলো। খালি বোতলটা যেন বাইরে ফেলে দিতে যাচ্ছে এই ভঙ্গি করে সেটা দিয়ে জোরে আঘাত করতে গেল তার পাশের যুবকটির মাথায়।

ফার্গুসনের এক চুমুকে বোতল শেষ করার দৃশ্য দেখতে দেখতে যুবক দু'জনই একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তাই আকস্মিক আঘাতের আগে তারা সাবধান হতে পারে নি।

ঠিক মতন লাগলে ঐ এক ঘাতেই কাজ হয়ে যেত। কিন্তু যুবকটি শেষ মুহূর্তে মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিল বলে আঘাতটা লাগলো গলা ঘেষে তার ঘাড়ে। সেখানে ভাঙা কাঁচ বসে গেল। সেই অবস্থাতেও সে পিস্তলটা হাতছাড়া করে নি- ফার্গুসন তার হাত থেকে সেটা কাড়তে যেতেই যে নিচু হয়ে বসে পড়ে গুলি করলো ওর পায়ে। গুলি লাগলো না। ফার্গুসন ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর ওপর।

অন্য যুবকটি তার সঙ্গীর গায়ে গুলি লাগতে পারে এই ভয়ে পিস্তল চালায় নি, এবার সে ঠিক মতন জায়গা নিয়ে বললো, সাবধান!

আহত যুবকটি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো, তার ঘাড়ের দু'দিক দিয়ে রক্ত পড়ছে আধখানা বোতল গেথে আছে সেখানে। সে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে দোস্ত ইংরেজিতে ফার্গুশনকে বললো, আই ফিল লাইক কিলিং ইউ রাইট অ্যাওয়ে। তোমাকে মারবার জন্য আমার হাত নিশপিশ করছে। কিন্তু মারতে পারছি না। কারণ, এই ট্রেন তোমাকেই চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অন্য যুবকটি বললো, তবু ওর পা খোড়া করে দিতে আপত্তি কি? খোঁড়া লোকও তো ট্রেন চালাতে পারে।

আহত যুবকটি বললো, থাক তার দরকার নেই!

এই সময় বাইরে ঘন ঘন হুইশল বেজে উঠলো। সেই শব্দ শুনে যুবক দুটি চঞ্চল হয়ে উঠলো। কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার ওদের যেতে হবে।

পিস্তল বাগিয়ে ধরে ওরা চলে এলো দরজার দিকে। আহত যুবকটি লাফিয়ে পড়লো আগে। অন্য যুবকটি নামবার আগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফার্গুসনের মাথায় এক ঘা মারলো তার মাউজার পিস্তলের বাঁট দিয়ে। চেঁচিয়ে বললো, তোমার বেয়াদপির সামান্য শাস্তি। তারপর নেমে পড়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

জায়গা আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা ছিল। পনর ষোল জন যুবক ছড়িয়ে ছড়িয়ে থেকে অন্ধকারের মধ্যে ছুটলো একই দিকে। কয়েকজন মিলে তিনটে বাক্স ধরাধরি করে নিয়ে আসছে।

একটু বাদে ট্রেনের কামরা থেকে কয়েকটা বন্দুকের গুলি এলো এদিকে। কোনটাই ওদের গায়ে লাগলো না। ট্রেন থেকে নেমে এসেও ওদের তাড়া করার সাহস পেল না। তাছাড়া ওরা যাত্রীদের কারোর কাছ থেকেই কিছু লুট করে নি বলে অনেকেই কখনো বুঝতে পারে নি ডাকাতরা ঠিক কি জন্য এসেছিল।

মাঠ পেরিয়ে খানিকটা জলা জায়গা। তার ওপর দিয়ে ছপছপ করে দৌড়াচ্ছে। সেটা পেরিয়ে আসার পর শুরু হলো জঙ্গল।

ট্রেন থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে বলে ওরা কয়েজজন এবার চর্ট জ্বালালো বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে মাইল দুয়েক দূরে একটা ফাঁকা মতন পরিষ্কার জায়গায় ওরা এসে থামলো।

এতক্ষণ একটানা দৌড়ে এসে ওরা সকলেই দারুণ হাঁপাচ্ছে। কয়েকজন ধপাস করে শুয়ে পড়লো মাটিতে।

মেঘলা মেঘলা আকাশ। নইলে আজ জ্যোৎস্না ওঠার কথা ছিল। তবু বনের গাছগুলোর মাথায় ক্ষীণ চাপা আলো ছড়িয়ে আছে। মাটিতে পড়েছে জাফরির মতন ছায়া।

গোঁফওয়ালা যুবকটি সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, সবাই এসেছে?

তাঁর পাশ থেকে একজন বললো, হ্যাঁ সব্বাই! আমাদের প্ল্যান দারুণ সাকসেস্‌ফুল! গোঁফওয়ালা যুবকটি বললো, তবু গুনে দেখা যাক। অরিন্দম গুণে দেখো তো!

অরিন্দম গোণা শেষ করার আগেই পেছনে থেকে একজন বললো, সুকুমারকে দেখছি না তো!

গুণেও দেখা গেল, একজনই মাত্র কম পড়ছে। এদের দলের মধ্যে সবচেয়ে যার বয়স কম, সেই সেখানে শুধু অনুপস্থিত।

যে যুবকটির কাঁধে কাঁচ ঢুকে গিয়েছিল, সে তখন মাটিতে বসে। তার সঙ্গী কাঁচের টুকরো টেনে বার করার চেষ্টা করছে। সে বলে উঠলো, সুকুমার আসে নি? কোথায় গেল? ওর গায়ে গুলিটুলি লেগেছে?

আর একজন বললো, না সুকুমারকে আমি আগেই চলে আসতে দেখেছি।

- তাহলে সে কোথায় গেল?

-রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে নাকি?

আহত যুবকটি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বললো, তাহলে সুকুমারকে এক্ষুণি একবার খুঁজে আসা দরকার।

যারা টাকা গুণছিল তারা শেষ করে বললো, রতনদা ভালোই পাওয়া গেছে। তিন লাখ তিরিশ হাজার!

অন্যরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলো।

রতনলাল ব্যস্ত হয়ে বললো,– এই এ কি ছেলেমানুষী করছো, চুপ করো।

চার পাঁচজন অস্ত্রধারী যুবকের হাতে টর্চ দিয়ে সে দাঁড় করিয়ে দিল একটু দূরে। ফিসফিস কর বললো, খুব সাবধানে লক্ষ্য রাখবি। খুব সামান্য একটু আওয়াজ হলেই চেঁচিয়ে উঠবি। কোনো রকম ভুল যেন না হয়।

তারপর সে অন্যদের নির্দেশ দিল, টাকাগুলো তিন ভাগ করে ফেল। এক ভাগ থাকবে আমার কাছে, রফিক আর সব্যসাচীর কাছে এক এক ভাগ। তার মানে প্রত্যেকের কাছে এক লাখ দশ হাজার টাকা। তোমরা সবাই সাক্ষী রইলে। এর প্রতিটি পাই হিসেব থাকবে। আজ থেকে এক মাস বাদে আমাদের সেই নির্দিষ্ট জায়গায় সবাই এসে জড়ো হবে। এর মধ্যে কেউ কারোর সঙ্গে দেখা করবে না। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও। এক্ষুণি যেতে হবে।

-বাক্স তিনটে কি হবে?

- এখানেই ফেলে রেখে যাও। এগুলো আর বয়ে নিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। এই সময় বনের মধ্যে মানুষের পায়ের চরার খচখচ আওয়াজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভিয়ে সবাই শুয়ে পড়লো মাটিতে। তখন ফিসফিস করে বললে, আমিনা বললে, কেউ গুলি করবে না!

অন্ধকার চোখে সয়ে যাবার পর দেখা গেল, একজন মাত্র মানুষ মাতালের মতন টলতে টলতে এদিকে আসছে। পথভ্রষ্ট কোনো গ্রাম্য লোক হলে চুপচাপ থাকাই ভালো।

লোকটা যেন ঠিক মতন হাঁটতে পারছে না। মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছে। বিড় বিড় করে কি যেন বলছে আপন মনে। একবার সে চেঁচিয়ে উঠলো, রতনদা–

তৎক্ষণাৎ রতনলাল চর্ট জ্বেলে বললো, ঐ তো সুকুমার-

অরিন্দম দৌড়ে গিয়ে সুকুমারকে জড়িয়ে ধরে বললো কি হয়েছে? কোথায় লেগেছে?

সুকুমারের চোখের দৃষ্টি ঘোর-লাগা। সে জড়ানো গলায় বললো, আমার কিচ্ছু হয় নি। আমি একজন লোককে মেরে ফেলেছি।

রতন এগিয়ে এসে বললো, তোর কোথাও লাগেনি তো?

সুকুমার বললো, না। আমি একটা গুলি ছুঁড় লাম, অমনি লোকটা মরে গেল। একজন নেপালী ভদ্রলোক। মানুষের মরা কি এত সহজ! একটু ছটফট পর্যন্ত করলো না।

-সুকুমার ঠিক হয়ে নে।

-আমি একজন মানুষ মেরেছি। আপনারা তো কেউ মারেন নি।

রতনলাল বললো, না তুই মারিস নি। আমরা সবাই মিলে মেরেছি। তোমরা সবাই শুনে রাখো। আজকের অ্যাকশনে একজন মানুষ মারা গেছে। তাকে মারার জন্য বিশেষ একজন দায়ী নই, আমরা সবাই এক সঙ্গে দায়ী।

তারপর সে টাকার থলিটা কাঁধে ঝুলিয়ে বললো, আর এক মিনিট দেরি নয়। রফিক সুকুমারকে নিয়ে যাক। সব্যসাচীও এখন একা যেতে পারবে না, অরিন্দম তুমি যাও ওর সঙ্গে। আর সবাই আলাদা আলাদা।

অন্ধকারের মধ্যে আর খানিকটা হেঁটে যাবার পর একটা গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা। সেখানের আট দশখানা সাইকেল রাখা হয়েছে; একজন পাহারা দিচ্ছে সাইকেলগুলো। এরা চটপট ভাগাভাগি করে উঠে পড়লো সাইকেলগুলোতে।

রতনলালের সাইকেলের পেছনে উঠলো নিরঞ্জন। সে বললো, রতনদা, আপনি খানিকটা চালাবেন, বাকিটা আমি চালাবো।

–এখানে? ওখানে এখন ফিরে যাওয়া সম্ভব?

- আমি যাচ্ছি।

গোঁফওয়ালা যুবকটি বললো, সব্যসাচী, কি বলছো কি? তোমার কাঁধ দিয়ে অত রক্ত পড়ছে। তুমি এখন কোথায় যাবে?

-আমার কিছু হবে না। সুকুমারকে ফেলে রেখে আসতে পারি না আমরা। রতন, তুমি আমার সঙ্গে আর দু'জনকে দাও। আমরা চট করে একবারে ঘুরে আসবে।

গোঁফওয়ালা যুবকটির নাম রতনলাল। সে বললো, সব্যসাচী, একটু দাঁড়াও। সুকুমারকে খুঁজতে গিয়ে যদি সবাইকে ধরা পড়তে হয়– তাহলে আমাদের সব কষ্ট ব্যর্থ হবে। আগে চটচট কাজগুলো সেরে নেয়া যাক। আগে বাক্সগুলো ভাঙা হোক। আমরা চাবি পাই নি।

কয়েকজনের কাছে ভোজালি এবং ছোরা ছিল। সেইগুলো দিয়ে বাক্সের তালায় মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হতে লাগলো। অবিলম্বে ভেঙে গেল সেগুলো। তখন দেখা গেল, তাদের ভুল হয় নি। বাক্সগুলোর মধ্যে থরে থরে টাকা সাজানো।

রতনলার বললো, টাকাগুলো এক্ষুণি ফেল!

অরিন্দম বললো, এখন গোনার দরকার কি? এখন সময় নষ্ট করে লাভ নেই। রতনলাল দৃঢ়ভাবে বললো, না এক্ষুনি গুনতে হবে। তিনজনে মিলে বসে যাও, চটপট।

কয়েকজন টাকা গুনতে বসেছে। রতনলাল তখন সব্যসাচীর কাছে এসে তার ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে দেখলো। কাঁচের বড় টুকরোটা তুলে ফেলা হলেও ভেতরে আরও দু'টো ছোট টুকরো রয়ে গেছে। কিছুতেই রক্ত বন্ধ করা যাচ্ছে না। সব্যসাচীর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য। বোঝা যায় তার দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু মুখে সে একটু ও শব্দ করছে না।

রতনলালকে দেখে সে একটু হাসার চেষ্টা করে বললো, এমন কিছু না।

রতনলাল বললো, হুঁ। আর কারোর কোথাও লেগেছে?

অরিন্দম বললো, কিছু না। এমন নিখুঁতভাবে সব হবে, আমি আশাই করি নি রফিকের একটা আঙ্গুল বোধ হয় গেছে।

অরিন্দমের পাশেই যে দাঁড়িয়ে ছিল, তার নাম রফিক আলম। প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা, টকটকে ফর্সা এবং মাথার চুলের রং লালচে, চোখের মণি নীলবর্ণ। সে তার বাঁ হাত টা চেপে ধরেছিল। এবার হাতটা তুলে বললো, না যায় নি শেষ পর্যন্ত। তবে, ব্যাটার ইচ্ছে ছিল আমার আঙুলটা খেয়ে ফেলার।

রতনলাল জিজ্ঞেস করলো,কি হয়েছিল?

রফিক বললো, আর্মড গার্ডটার হাত পা বাঁধার পরও চেঁচামেচি করতে যাচ্ছিল, তখন ভাবলাম ব্যাটার মুখটাও বেঁধে ফেলি। যেই বাঁধতে গেছি, ব্যাটা অমনি খ্যাঁক করে আমার একটা আঙ্গুল কামড়ে ধরলেন। ওরে বাপরে বাপ, ঠিক যেন কচ্ছপের কামড়। তখন ওর নাকটা চেপে ধরলাম খুব জোরে– তারপর ছাড়লো।

দেখা গেল রফিকের বা হাতের তর্জনী লাল হয়ে ফুটে উঠেছে। বড় বড় দাঁতের দাগ। রতনলাল বললো, মানুষের দাঁতের বিষ থাকে।

রফিক হাসতে হাসতে বললো, আমার শরীরেও বিষ আছে। বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে।

অরিন্দম বললো, একজন সাহেব জানলা দিয়ে গুলি ছুড়েছিল সেই গুলি সুকুমারের গায়ে লাগে নি তো?

আর একজন উত্তর দিল,না। গুলিটা আমার আর নিরঞ্জনের দিকে ছুঁড়েছিল, আমরা মাটিতে শুয়ে পড়েছিলাম। আমাদের গায়ে লাগে নি। নিরঞ্জন গুলি করে সাহেবটার হাত ভেঙ্গে দিয়েছে।

- আর কারুকে মারতে হয় নি তো?

- আর একজন লোককে নিচে মরে থাকতে দেখেছি। আমাদের দলের কেউ নয়। বোধ হয় সুকুমারই তাকে–

রতনলাল বললো, চল তো দেখা যাক। বোধ হয় তার দরকার হবে না। দেখাই যাক না। আমি টানা কুড়ি পঁচিশ মাইল চালাতে পারবো। তুই রাস্তার দিকে নজর রাখবি। কেউ আমাদের চ্যালেঞ্জ করলে কোন উত্তর না দিয়ে সোজা গুলি চালাবি!

-সুকুমার খুব শক পেয়েছে।

-বড্ড ছেলে মানুষ তো। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

-আমরা কোথায় যাবো? বাংলাদেশের বাইরে?

-না। এখন কোনো গ্রামে থাকতে হবে। তারপর কলকাতা। এটা জেনে রাখিস, কলকাতার মতন লুকোবার এত ভাল জায়গা আর কোথাও নেই।

-আমার কিন্তু মনে হয় বেনারস।

-তুই বেনারস যেতে পারিস। তবে আপাততঃ আসানসোলে গিয়ে তোকে আমি ছেড়ে দেবো। এখন দু'জনের এক সঙ্গেও থাকা উচিত নয়।

এতক্ষণ রাস্তা একেবারে ফাঁকা ছিল। এখন পাশে পাশে দু'একটা ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু'একটা কুকুর ডেকে উঠছে ঘেউ ঘেউ করে।

নিরঞ্জন বললো, রতনদা, আপনি অযোধ্যা সিং-এর দলের নামটা করে খুব ভালো করেছেন। গার্ডবাবু নিশ্চয়ই পুলিশকে ঐ নামটা জানাবে। পুলিশ প্রথমে অযোধ্য সিংকেই খুঁজবে।

রতনলাল গম্ভীরভাবে বললো, পুলিশ অত বোকা নয়।

তারপর সে আরও জোরে সাইকেল চালাতে লাগলো।

॥ দুই ॥

সব্যসাচীকে পিছনে বসিয়ে অরিন্দম সাইকেল চালাচ্ছে। সব্যসাচী একহাতে জড়িয়ে ধরে আছে তার কোমর। কাঁধে এখনও কাঁচ ঢুকে আছে, অসহ্য যন্ত্রণায় তার শরীরটা ক্রমেই অবশ হয়ে আসছে। অরিন্দম কথা বলে বলে তাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল, সব্যসাচীর শরীরটা এলিয়ে পড়েছে তার পিটের ওপর। আর পারছে না। এই অবস্থায় যদি থাকতে পারে, তাতেও ক্ষতি নেই। পড়ে না যায়।

অরিন্দম জিজ্ঞেস করলো, কি রে, তোর খুব কষ্ট হচ্ছে?

সব্যসাচী বললো, উঃ না বেশি না–

-যেতে পারবি, না কোথাও থামবো?

-না, থামাতে হবে না। চালা, আরও জোরে চালা।

-এত সহজে যে আমাদের কাজ হয়ে যাবে, ভাবতেই পারি নি। শুধু যদি তোর কাঁধে না লাগতো।

-আমার কিছু হয় নি। কিছু হয় নি!

খানিকটা বাদে পেছনে ফরফর করে কাগজের শব্দ হতে অরিন্দম চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। কান্ড দেখে তার দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। সব্যসাচীর গলায় ঝোলানো একটা কাপড়ের ব্যাগ ভর্তি টাকা। এক লাখ দশ হাজার টাকা। সব্যসাচী অচৈতন্য হয়ে আছে, আর হাওয়ায় সেই টাকাগুলো উড়ে যাচ্ছে ফরফর করে। কতক্ষণ থেকে এ রকম শুরু হয়েছে কে জানে।

অরিন্দম তাড়াতাড়ি সাইকেল থামালো। ঝাঁকুনিতে চোখ মেলে সব্যসাচী জিজ্ঞেস করলো, কি হলো?

অরিন্দম বললো, সর্বনাশ হয়েছে। টাকাগুলো উড়ে যাচ্ছে!

- যাঃ, টাকা কি করে উড়ে যাবে। কিছু খরচ করি নি তো!

-তুই ঘুমিয়ে পড়েছিলি। তোর ব্যাগ থেকে উড়ে পড়ে যাচ্ছে।

বিকারের ঘোরে সব্যসাচী বললো, যাক! যাচ্ছে যাক।

কিন্তু যাক বললেই তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। হিসেবের টাকা। রতনলাল সবাইকে সাক্ষী রেখে বলে দিয়েছে, পাই, পয়সা পর্যন্ত হিসেব করে দিতে হবে। হাওয়ায় টাকা উড়ে গেছে, এটা কি কোনো হিসেব হতে পারে? এত কষ্টের টাকা। কতক্ষণ থেকে পড়ছে কে জানে।

তাছাড়া,র াস্তায় টাকা ছড়িয়ে আছে। কাল সকালেই লোকের চোখে পড়ে যাবে। চেঁচামেচি শুরু হবে। পুলিশ আসবে। পুলিশ ওদের পালাবার পথের একটা পরিষ্কার চিহ্ন পেয়ে যাবে।

অরিন্দম সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। সব্যসাচীর হাত ধরে বললো, নেমে একটু বোস। আমি দেখছি।

সব্যসাচীর গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। শরীর থেকে নিশ্চয়ই অনেক রক্ত ঝরেছে সে জন্য তার মতন শক্তিশালী লোকও এত দুর্বল হয়ে পড়েছে। অরিন্দমের হাত ধরে টলতে টলতে এসে সে একটা গাছতলায় শুয়ে পড়লো।

অরিন্দম তাকে এক ঝুকুনি দিয়ে বললো, একটু চেষ্টা করে জেগে থাক। সঙ্গে এতগুলো টাকা, তাছাড়া সাইকেলটা যদি চুরি যায়- তাহলে আমরা গেছি।

সব্যসাচী নড়ে চড়ে কোনোক্রমে উঠে বসলো গাছটাতে হেলান দিয়ে। সুস্থ হাতটা দিয়ে রিভরবারটা ধরে রাখলো সামনের দিকে।

অরিন্দম টাকাগুলো খুঁজতে গেল। সব টাকা তো রাস্তার মাঝখানেই পড়ে নি, হাওয়ায় এদিক ওদিক উড়ে গেছে। টর্চ জ্বেলে দেখতে দেখতে কয়েকটা পাওয়া গেল। আরও কয়েকটা চোখের আড়ারে রয়ে যাচ্ছে কি না কে জানে।

বেশ কিছুটা রাস্তা ধরে ফিরে এসে অরিন্দম অনেকগুলো নোট জড়ো করলো। আরও কত আগে থেকে টাকা পড়তে শুরু করেছে তার ঠিক নেই। রতনলাল টাকাটা অরিন্দমের কাছে দেয় নি, দিয়েছে সব্যসাচীকে। কারণ, সেই রকমের ঠিক করা ছিল আগে থেকে। সব্যসাচী যে এতটা অসুস্থ হয়ে পড়বে, আজ কেউ বুঝতে পারে নি।

কিন্তু এইভাবে সময় নষ্ট করাও তো খুব বিপজ্জনক। কিছু টাকা যদি কম পড়ে, সবাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে বিশ্বাস করবে না? কি জানি!

অরিন্দমের মুখে একটা তেতো স্বাদ এলো, খুবই ক্লান্ত বোধ করতে লাগলো সে। এরকমভাবে রাত্রির অন্ধকারে টাকা খোজাখুজির কোনো মানেই হয় না। একবার তার একথাও মনে হলো, টাকাটা ঠিকঠাক রাখার দায়িত্ব তো তার নয়, সব্যসাচীর। সে কেন এত খেটে মরছে। সঙ্গে সঙ্গে সে চিন্তাটা মন থেকে তাড়িয়ে দিল। সব্যসাচীকে নিরপদে পৌছে দেবার দায়িত্ব তার। সেটা সে কি করে অস্বীকার করে।

দূরে কিছু লোকের গলায় আওয়াজ পেয়ে অসম্ভব ভয় পেয়ে গেল অরিন্দম। টাকার গোছা হাতে নিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগলো।

গাছতলায় এসে দেখলো সব্যসাচী আবার ঘুমে ঢলে পড়েছে।

এই অবস্থায় একটা বাচ্চা ছেলেও এসে ওর কাছ থেকে রিভলবার এবং টাকাগুলো চুরি করে নিয়েযেতে পারতো। অরিন্দম তাকে ধাক্কা দিয়ে বললো, এই, ওঠ।

সব্যসাচী অতি কষ্টে চোখ মেরে বললো , আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। রাত্রিটা এখানেই ঘুমিয়ে থাকি না।

-লোকজনের গলা শুনতে পাচ্ছি। আর এক মিনিট দেরী করা যাবে না।

- আমায় তুলে ধর।

টাকার থলির মুখটা ভালো করে বেধে অরিন্দম প্রথমে সেটা নিজের গলায় ঝোলালো। তারপর কি ভেবে আবার সেটা খুলে পরিয়ে দিল সব্যসাচীর গলায়। তার পর তাকে টেনে তুললো সাইকেলের পেছনে। নিজে সাইকেলের প্যাডেলে পা দিয়ে বললো, আমাকে শক্ত করে ধরে থাকিস।

সব্যসাচী বললো, তোর চিন্তা নেই। আমি ঠিক পারবো।

অরিন্দম মরিয়া হয়ে সাইকেল চালাতে লাগলো। শন্‌শন্‌ করে হাওয়া বইছে, মাঝে মাঝে কয়েকটা কুকুর তাড়া করে আসছে,তবু কোনো দিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। তার পিঠের ওপর সব্যসাচীকে সম্পূর্ণ দেহের বোঝা।

প্রায় দু'ঘন্টা সাইকেল চালিয়ে অরিন্দম একটা ছোট মফঃস্বল শহরে এসে পৌছালো। সারা শহরটা ঘুমন্ত। একটা দোতলা বাড়ির পেছনে দিকের বাগানে এসে থামলো অরিন্দম। সাইকেলটাকে দেয়ারে হেলান দিয়ে রেখে সব্যসচীকে টানতে টানতে নিয়ে এলো বাগানের গেটের কাছে।

গেট খোলাই ছিল। বাগান বলতে কয়েকটা গোলাপ ফুলের গাছ, আর এক ঝাড় গাঁড়া আর জবা। বেশ একটা হালকা সুন্দর গন্ধ ছড়িয়ে আছে সেখানে।

বাগান পেরিযে এসে বাড়িটার পেছনের দরজায় টোকা মারলো অরিন্দম। তিনবার টোকা মারতেই দরজা খুলে গেল। সেখানে দুটি নারী দাঁড়িয়ে, একজন মধ্যবয়স্ক, আর এক জনের বয়স আঠারো উনিশ।

অরিন্দম সব্যসাচীকে নিয়ে টপ করে ভেতরে ঢুকে দরজায় পিঠ দিয়ে দাড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো। এতক্ষণ তার দারুণ পরিশ্রম হয়েছে, এখন সে যেন আর দাঁড়াতে পারছে না। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, মেজদি, জামাইবাবু বাড়িতে নেই তো!

পৌঢ়া মহিলা বললেন, না ট্যুরে গেছেন। এর কি হয়েছে?

সব্যসাচী নিজে বললো, আমি শোবো। আমার বিছানা লাগবে না, মাটিতে একটু জায়গা হলেই –

অরিন্দম বললো, চল ভেতরের ঘরে চল–

সব্যসাচী তবু জড়িত গলায় বললো, না, আমি ভেতরে যাবো না। আমি কাল সকালেই চলে যাবো। এখন এখানে একটু শুয়ে থাকতে পারি।

অরিন্দম তাকে জোর করে টেনে বললো, কি হচ্ছে কি? চল ভেতরে শোবার জায়গা আছে।

অরিন্দম একা তাকে নিয়ে যেতে পারছেনা, পৌঢ়া মহিলাটিও ধরলেন সব্যসাচীকে। যুবতী মেয়েটি অবাক বিস্ময়ে এদের দু'জকে দেখছে।

বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ির এক পাশে একটি ছোট ঘর। অরিন্দমের মেজদি বললেন, ওপরে উঠতে পারবে তো?

অরিন্দম বললো , তার দরকার নেই। এই ঘরটা খালি আছে তো?

সিড়ির পাশের ঘরটা ছোট। তাতে শুধু একটা খাট ও মাদুর পাতা। ওরা সেই ঘরে ঢুকলো। সব্যসাচী টলতে টলতে গিয়ে হুড়মুড় করে শুয়ে পড়লো। খাটে। আচ্ছন্ন গলায় বললো আমি কালকেই ঠিক হয়ে যাবো!

সব্যসাচী কাঁধের বিরাট ক্ষতটা দেখে শিউরে উঠে মেজদি বললেন, ইস! এ কি হয়েছে?

অরিন্দমও বসে পড়েছে মাটিতে। ক্লান্ত ভাবে বললো, জল, আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াবে?

মেজদি বললেন, খাবার তৈরি আছে। একটু দাঁড়া শুধু জল খেতে হবে না।

তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। খাবার খাবো না শুধু জল দাও।

এই কুন্তলা, জল নিয়ে আঁয় তো।

যুবতী মেয়েটি চকিত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একটু পরেই এক থালা সন্দেশ আর বড় ঘটিতে জল নিয়ে ফিরে এলো।

একটা সন্দেশ মুখে পুরে অরিন্দম ঢক ঢক করে প্রায় সব জলটুকু শেষ করে ফেললো। খানিকটা সুস্থ হয়ে নিশ্বাস ছেড়ে বললো,আ! প্রায় দশ আটকে আসছিল আমার!

মেজদি সব্যসাচীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ও কিছু খাবে না?

- ওর কিছু খাবার ক্ষমতা নেই।

- অতখানি কাটলো কি করে? ইস এখনো রক্ত পড়ছে।

-পরে সব বলছি। খানিকটা গরম জল আর তুলো আনতে পারবে? ওর ঐ জায়গাটা এখনই ড্রেস করে দেওয়া দরকার।

কুন্তলা নিজে থেকেই বললো, আমি জলগরম করে আনছি।

সে চলে যাবার পর মেজদি জিজ্ঞেস করলেন। কোনো গণ্ডগোল হয় নি তো?

অরিন্দম বললো, সব একেবারে ঠিকঠাক হয়েছে। শুধু রফিকুলদার একটা আঙ্গুল জখম হয়েছে, আর সব্যসাচীর এই চোট লেগেছে। ওরটাই বেশি।

তোরা কারুকে মারিস-টারিস নি তো?

একটু ইতস্তত করে অরিন্দম বললো না! আমি অন্তত জানি না টাকা অনেক পাওয়া গেছে। এবারে বড় রকম কাজ শুরু করতে হবে।

-এখন কয়েক মাস চুপচাপ থাকিস। তোদের যেন কেউ সন্দেহ না করে।

- মেজদি, তোমার এখানে ক'দিন থাকা যাবে?

-তোর জামাই বাবু ফিরবে আর দু'দিন বাদে।

- ওঃ. তার মধ্যে সব্যসাচী ঠিকঠাক হয়ে যাবে। ওর স্বাস্থ্য খুব ভালো। তারপর আমরা কলকাতয় চলে যাবো। সেখানে আমাদের ভালো জায়গা আছে।

মেজদি অরিন্দমের পিঠে হাত দিয়ে কম্পিত গলায় বললেন, অরু শেষ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক হবে তো?

অরিন্দম বললো, আমরা কতটা পারবো জানি না। কিন্তু আমাদের যার যেটুকু সাধ্য তা করে যেতে হবে। সব কিছুরই দাম আছে। আমরা যদি বৃটিশ রাজত্বের একটা ভিতও আলগা করে দিতে পারি–

সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু তোরা যে নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিচ্ছিস।

-তুমি ভয় পেয়ো না। আমাদে কিছু হবে না।

- হ্যা রে, এই রকম মারামারি খুনোখুনি ছাড়া অন্য কোন পথে যাওয়া যায় না?

-এত বড় শত্রু আমাদের সামনে, যে তাকে আমাদে র শক্তি না দেখালে সে কিছুই মেনে নেবে না। আঘাতের উত্তরে পাল্টা আঘাত করতে হবে।

হঠাৎ কথা থামিয়ে অরিন্দম জিজ্ঞেস করলো, তোমার ননদ সব দেখছে। ও কি রকম? শক্ত মেয়ে তো?

ওর জন্য চিন্তা করিস না। ওর খুব মনের জোর। ওকে তোরা তোদের দলে নিতে পারিস!

-এখন আমাদের দলে মেয়েদের নেবার দরকার নেই। মেয়েদের নিলেই অনেক গণ্ডগোল দেখা দেয়।

-তোরা এটা ভুল করছিস। মেয়েরা অনেক কাজ পারে যা ছেলেরা পারে না। শুধু শুধু তোরা মেয়েদের দূরে ঠেলে রাখছিস।

- তোমরা এই যে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করছো এটাও তো একটা মস্ত বড় কাজ।

এই সময় কুন্তলা এক বাটি গরম জল আর তুলো নিয়ে ফিরে এলো। অরিন্দম উঠতে যেতেই মেজদি বললেন, তুই বোস। আমরা দেখছি!

কুন্তলা গরম জলে তুলো ভিজিয়ে সব্যসাচীর কাঁধের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত মুছে দিতে গেল। সেখানে তখন কয়েকটা কাঁচের টুকরো গেঁথে রয়েছে দেখে শিউরে উঠলো সে।

মেজদি বললেন, এই কাঁচগুলো এক্ষুনি তুলে না ফেললে সেপটিক হয়ে যাবে যে! কুন্তলা বললো, আমার বন্ধু বিজয়ার বাবা ডাক্তার, তাকে ডেকে আনবো?

অরিন্দম বললো না। এখন কারুকে ডাকার দরকার নেই।

- উনি খুব ভালো লোক।

- এখন কারুকেই বিশ্বাস করা যায় না।

কুন্তলা নিজের চেষ্টায় একটা কাচের টুকরো তুলতে যেতেই যন্ত্রণায় জেগে উঠলো সব্যসাচী। বিরক্তভাবে বললো, আঃ কি হচ্ছে কি?

অরিন্দম উঠে এসে ঝুকে পড়ে বললো, একটু ধৈর্য ধরে থাক্ - কাঁচগুলো তুলে ফেলতে হবে।

-কিছু তুলতে হবে না।

কুন্তলা বললো, আস্তে, খুব আস্তে তুলবো, আপনার বেশী লাগবে না।

- বলছি না, কিছু তুলতে হবে না।

কুন্তলা বললো,

অরিন্দমকে বললো, আপনি ওকে চেপে ধরে থাকুন। বৌদি, তুমি কাঁধটা ধরো-

ওরা সেই রকমভাবে ধরলো। কুন্বলা আবার নিচু হয়ে কাঁচ তুলতে যেতেই সব্যসাচী জোরে একটা ঝটকা মারলো, একটা হাত তার এত জোরে উঠেছিল যে দড়াম করে লাগলো কুন্তলার মুখে। সে বেচারী এক পলকের জন্য অন্ধকার দেখলো চোখে।

সব্যসাচী এবার উঠে বসলো। তারপর বললো, কি হচ্ছে এসব? কেন আমাকে জ্বালাতন করা হচ্ছে?

অরিন্দম ভৎর্সনার সুরে বললো, কেন এরকম ছট্‌ফট্ করছিস? কাঁচগুলো না তুললে কি হবে জানিস?

-যা হয় হোক। আমি এখন চুপ করে ঘুমাতো চাই আমাকে বিরক্ত করিস না।

-অরিন্দম এবার কণ্ঠস্বর নরম করে বললো, সব্যসাচী কেন ছেলেমানুষী করছিস? তোর ভালোর জন্যই তো–

সব্যসাচী বললো, ভীষণ যন্ত্রণা। পারছি না। আচ্ছা, আমি চুপ করে আসছি, এবার তোল।

কুন্তলা কাছে এসে বললো, আবার আমার মুখে মারবেন না তো?

-খুব লেগেছে?

- না, খুব না।

- এবার তুলুন।

ধারালো কাঁচের টুকরোগুলো খালি হাতে তোলা বিপজ্জনক। কুন্তলা হাতে একটা রুমাল জড়িয়ে নিয়েছে। সেইজন্য ভালো করে ধরতে পারছে না।

সব্যসাচী নিজেই বললো, ও ভাবে হবে না। একটা কাঁচি গরম করে নিন্ –তারপর দেখুন।

সেই ভাবেই চেষ্টা হলো কিছুক্ষণ। স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে একটা কাঁচিকে গরম করে ক্ষতস্থানটা আরও খুচিয়ে খুচিয়ে কাঁচ তোলা হতে লাগলো। কয়েকটা বেরিয়ে এলো। দুটো ছোট টুকরো বার করা যাচ্ছে না। সব্যসাচী দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইলো, একবারও টু শব্দ করলো না।

কুন্তলা পাকা নার্সের ভঙ্গিতে খোঁচাখঁচি করে যাচ্ছে। এক সময় সব্যাসাচী বললো, আজ থাক।

-দুটো টুকরো অনেক ভেতরে ঢুকে গেছে। কিছুতেই বেরুচ্ছে না। আর একটু চেষ্টা করি?

সব্যসাচী করুণ মুখ তুলে বললো, আমি আর পারছি না। ভীষণ লাগছে যে।

মেজদি বললেন, কি হবে তা হলে?

-দুটো কাঁচের টুকরো শরীরের মধ্যে থাকলে কিছু হবে না।

-তা কি হয়?

কুন্তলা বললো, আমিও সাহস পাচ্ছি না। যদি বেশি লেগে টেগে যায়?

অরিন্দম বললো, এখন থাক তাহলে। জায়গায় বরং যেঞ্জিন দিয়ে ভিজিয়ে দাও। বেঞ্জিন আছে বাড়িতে?

-আছে।

কে না জানে, বেঞ্জিন লাগালে দারুণ জ্বালা করে। সব্যসাচী অরিন্দমকে বললো, তুই আমার মুখটা চেপে ধর। যদি আমি চেঁচিয়ে ফেলি।

অরিন্দম সব্যসাচীর মুখে হাত চাপা দিল। কিন্তু তার দরকার ছিল না। নিজেই দম বন্ধ করে রেখেছে সব্যসাচী, তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

বেঞ্জিন লাগাবার পর তুলো চাপিয়ে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হলো। তারপর সব্যসাচী ধপ করে শুয়ে পড়লো আবার। মাথায় নিচে বালিশ নেই।

কুন্তলা দৌড়ে বালিশ এনে দিল দুটো। অরিন্দম সেই বলিশের নিচে টাকার থরে আর রিভলবারটা রেখে দিল। তাপর বললো, এবারও ঘুমোক্। রাত্রিরটা তো কাটুক।

ঘরের আলো নিভিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল।

॥ তিন ॥

রফিক আর সুকুমার বর্ধমান স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিল। সুকুমার তখনও ছটফট করছে। সারা রাত সে ঘুমলো না। চোখের পাতা বুজলেই সিনেমার মতন ভেসে উঠেছে সেই দৃশ্য–গুলি খেয়ে নেপালী ভদ্রলোকটি চুপ করে পড়ে গেলেন, মাটিতে–মুখখানা কি দারুণ কুঁকড়ে গেচে সুকুমার পালাতে চাইছে তবু পালাতে পারছে না!

রফিকও জেগে রইলো সারা রাত। থার্ডক্লাস ওয়েটিং রুমের গাদা গাদা মানুষের পাশে ওরা দু'জনেও ঘাপটি মেরে আছে। রফিকের চোখ বাইরের দিকে। খবর রটে গেছে এতক্ষণে– সারা রাত ধরেই পুলিশের আনাগোনা চলছে। শোনা যাচ্ছে ভারী বুট জুতো পরা পায়ের দাপাদাপি।

এবার কয়েকজন পুলিশ এই ওয়েটিং রুমের মধ্যেও ঘুরে গেল। সেই সময় ওরা দম বন্ধ করে গাঢ় ঘুমের ভান করে রইলো। পুলিশ অবশ্য করুকেই ঘাঁটলো না।

সুকুমার মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে আর ভয়ে জড়িয়ে ধরছে রফিকের হাত। রফিক ফিসফিস করে বললো, আরে আমার এ হাতে ব্যথা। অন্য হাতটা ধর।

আহত আঙ্গুলটা রফিক একবার চোখের সামনে এনে দেখলো স্পষ্ট তিনটে দাঁতের দাগ। মানুষের দাঁত। মানুষের দাঁতের নাকি বিষ থাকে? তবে ব্যথাটা আর বেশি বাড়ে নি।

ভোর হতে না হতেই মানুষজন জাগতে শুরু করেছে। রফিক আর সুকুমার তখনও উঠলো না। লোকজনের ভিড়ে যখন প্লাটর্ফম একেবারে গম্ গম্ করতে লাগলো, তখন ওরা জাগলো। চা-ওয়ালার কাছ থেকে দু'ভাড় চা কিনে নিয়ে রফিক সুকুমারকে বললো, যা, গোসলখানা থেকে ঘুরে আয়।

সুকুমার ফিরে আসার পর তাকে বসিয়ে রেখে রফিক গেল বাথরুমে সেরে আসতে। ফিরে এসে দেখলো সুকুমার নেই। তার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। টাকার থলে ও রিভরভারটা সে সুকুমারের কাছে জমা দিয়ে গিয়েছিল।

রফিক তীব্র চোখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। প্লাটফর্মের বাইরে এসে খুঁজতে লাগলো সুকুমারকে। এইটুকু সময়ের মধ্যে সে কোথায় যাবে? সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তার সাইকেলটা এখনো রয়েছে।

একটু বাদে দেখলো, দূরে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে সুকুমারতাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রফিক প্রায় দৌড়ে তার কাছে এসে বললো, চলে এলি কেন? সুকুমার ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বললো, চুপ! পুলিশ।

রফিক পেছনে তাকিয়ে দেখলে, স্টেশনে গেটের কাছে দু'জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পুলিশ নিজেদের মধ্যে কি সব কথা বলছে।

রাগে রফিকের গা জ্বলে গেল। ইচ্ছা হলো সুকুমারকে এক চড় কষাতে। চাপা গলায় বললো, আরে বেকুব, ঠোঁট থেকে হাত নামা!

- রফিকদা, পুলিশ দুটো আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল।

বেশ করেছে। পুলিশ দেখে ওরকম ভয় পেলে এক্ষণি ধরা পড়বি।

রফিক বুঝতে পারলো, সুকুমারের মুখ চোখের চেহারা অস্বাভাবিক। গত রাত্রের ঘটনায় সে এমন একটা ধাক্কা খেয়েছে যে অনেকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। বড্ড ছেলেমানুষ!

রফিক ওর হাত থেকে নিজের পুটলিটা কেড়ে নিয়ে বললো, তুই এবার কোন দিকে যাবি? আমি তো ট্রেনে উঠবো।

সুকুমার রফিকের হাত জড়িয়ে ধরে বললো, রফিকদা আমাকে ছেড়ে যেও না! আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

- না, না, এখন এক সঙ্গে থাকা ঠিক নয়। এখন সবাইকে আলাদা থাকতে হবে।

সুকুমার তবু ছেলেমানুষের মতন বললো, রফিকদা আমাকে ছেড়ে যেও না।

সুকুমারের সম্পর্কে রফিকের মনে খানিকটা মায়া আছে। বিপ্লবীদের মনে এরকম দয়া-মায়ার প্রশয় ঠিক নয়। তাতে কাজে ভুল হয়ে যায়। তবু রফিক সুকুমারকে এই অবস্থায় ছাড়তে পারলো না।

খানিকটা নরমভাবে বললো, চল আমার সঙ্গে। কিন্তু একদম চুপ-চাপ থাকবি। ঐ পুলিশ দু'জনের সামনে দিয়েই আমাদের স্টেশনে ঢুকতে হবে আবার, পারবি তো?

-পারবো।

বাইরের কাউন্টার থেকে রফিক দু'খানা টিকিট কিনে নিল কলকাতার। তারপর গুণগুণ করে। একটা গান গাইতে গাইতে এগোলো স্টেশনের দিকে।

পুলিশ দু'জন তখনও গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রফিক তাদের কাছাকাছি এসে একজন পুলিশকেই জিজ্ঞেস করলো, সাব, আপকা ঘড়ি মে কিত্না বাজা হ্যায়?

একজন সার্জেন্ট বিরক্তভাবে ঘড়ি দেখে বললো, সাড়ে আট। তারপরেই সে অন্য জনের সঙ্গে কথা বলায় আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ভেতরে এসে হাসি মুখে রফিক তাকালো সুকুমারের দিকে। সুকুমারের মুখখানা পুরোনো কাগজের মতন বিবর্ণ। সে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

রফিক বললো, আচ্ছা ডরপুক দেখছি তুই। চল, নাস্তা করে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সুকুমার বুঝতে না পেরে বললো কি, করবো?

-জলখাবার! খিদে পায় নি? একটু কিছু খাবার-টাবার খেলেই জোর আসবে।

খাবার দোকানের সামনে এসে অর্ডার দেবার আগে রফিক সুকুমারকে জিজ্ঞেস করলো, তোর কাছে কিছু টাকা পয়সা আছে তো? আমি রেলের টিকিট কাটলাম, আমার কাছে বেশী পয়সা নেই।

রফিকের কাছে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা রয়েছে, কিন্তু সে টাকা খরচ করার অধিকার নেই তার।

সুকুমার পকেট থেকে সাতটা টাকা বার করে বললো, এই আছে।

–যথেষ্ট।

ওরা দু'জনে ডিম সেদ্ধ, টোস্ট, জিলিপি, চা খেল পেট পুরে। খাওয়া তখনো শেষ হয়নি। এই সময় ঝম ঝম করে, একটা কলকাতাগামী ট্রেন এসে দাঁড়ালো।

রফিক বললো, তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ কর, আমার এই ট্রেনে উঠবো।

-সাইকেলটা কি হবে?

- জাহান্নামে যাক্ সাইকেল।

ছুটির দিন, ট্রেনের বিশেষ ভিড় নেই। তবে প্রত্যেক স্টেশনেই পুলিশ এসে উঁকি মেরে যাচ্ছে। কি তারা দেখছে কে জানে। রফিক নিশ্চিন্ত মনে জানলার ধারে বসে গান গাইছে। সুকুমার এখন একটু একটু ঘুমে ঢুলছে।

কিছুক্ষণবাদে দু'জন সহযাত্রী গায়ে পড়ে আলাপ করতে এলো রফিকের সঙ্গে। রফিক এখন পৃথিবীতে কারুকে বিশ্বাস করতে পারে না। এই লোক দুটি অনায়াসে ইনফরমার হতে পারে। রফিকের চেহারাটা এমনই যে তাকে চট করে বাঙালী কি অবাঙালী ঠিক বোঝা যায় না। সে অনর্গল উর্দু মেশানো হিন্দী বলা শুরু করতেই লোক দু'টি দমে গেল একটু।

হাওড়া স্টেশনে আসবার আগেই ওরা নেমে পড়লো বেলুড়ে। সেখান থেকে বাস ধরলো। গঙ্গার ঘাট থেকে ফেরি নৌকায় চলে এলো এপারে। তারপর একটা রিক্‌শা চেপে চললো খিদিরপুরের দিকে।

রফিক জিজ্ঞেস করলো, কলকাতায় তোর মেসে তো ফেরা যাবে না। আর কোনো থাকবার জায়গায় নেই?

সুকুমার বললো, না।

- সে রকম কোনো বন্ধু নেই?

- রফিকদা, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

- কি মুশকিল, তুই কি আমার সঙ্গে আঠার মতন লেগে থাকবি নাকি? রতনলাল কি বলেছে শুনিস নি? এখন সবাইকে আলাদা থাকতে হবে।

-আমি তা হলে কোথায় যাবো?

সুকুমার কথাটা এমন অসহায়ভাবে বললো যে রফিকের বুকটা মুচড়ে উঠলো। এই ছেলেটার মন এখন অবশ হয়ে আছে। ওকে একা ছেড়ে দেওয়া যায় না। ওর কাঁধে হাত রেখে বললো, চল!

কোথায়?

- মুসলমান পাড়ায় থাকতে পারবি?

- কেন পারবো না?

- মুসলমান পাড়ায় পুলিশ বিশেষ সন্দেহ করবে না। কিন্তু পাড়ার লোক যদি চিনে ফেলে?

আমি লুকিয়ে থাকবো।

- চল্ তো, দেখা যাক্।

বস্তির ধার ঘেষে একটা দোতলা বাড়ি। এক তলায় দু'ঘর ভাড়াটে। ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো দোতলায়। সিঁড়ির মুখেই দরজা, সেটা বন্ধ। কয়েক বার ধাক্কা দিতেই একজন বৃদ্ধ বাবুর্চি ধরনের লোক সেটা খুলে দিল। সে রফিককে দেখে দু'হাত ছড়িয়ে একটা হতাশার ভঙ্গি করে বললো, আ– কোনোদিন কি একটু খবর দিয়ে আসতে নেই? আগে থেকে খবর দিলে–

রফিক হাসতে হাসতে বললো, ব্যবসার কাজের কি সময় ঠিক থাকে? করিম ভাই, আমার এক দোস্তকে নিয়ে এসেছি। বহুৎ আচ্ছা সে দেখভাল কর্ না, হ্যাঁ?

করিম বললো, তোমার দোস্ত্ এত দুবলা কেন? এখানে এক মাহিনা দো থাকো– আমি ভালো করে খাইয়ে জোওয়ান করে দেবো!

- দেখি, আজ দুপুরে ভালো করে খাওয়াও তো!

ওরা এসে ঢুকলো চমৎকার সাজানো গোছানো ঘরে। করিম চলে আসার পর রফিক বললো, এটা আমার চাচার বাড়ি। চাচা থাকেন মুর্শিদাবাদে, ব্যবসার কাজে এখানে মাঝে মাঝে আসেন।

একটা আলমারি ভর্তি জামা কাপড়। সেটা খুলে রফিক বললো, যেটা খুশি পরতে পারিস তবে, দিনের বেলা বেশির ভাগ সময় লুঙ্গি পরে থাকবি, বুঝলি?

-আচ্ছা।

-আর একটা কথা। এখানে অনেক খুবসুরত জানান আছে। তাদের দিকে তাকাবি না। মুসলমান মেয়ের প্রেম তুই সহ্য করতে পারবি না।

সুকুমার লাজুকভাবে হাসলো।

স্নানটান সেরে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে ওরা দু'জনেই দারুণ ঘুম দিল। জেগে উঠলো একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবার পর।

করিম পট ভর্তি চা বানিয়ে কোথায় যেন বেরিয়েছে। ঠান্ডা হয়ে গেছে চা।

রফিক বিরক্তির শব্দ করে বললো, এখন কে আবার চা বানায়। এই, তুই চা করতে পারিস?

সুকুমার বললো, চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তার কথা শুনলেই বোঝা যায়, সে কোনোদিন রান্নাঘরে ঢোকে নি। সবাই জানে সুকুমার একটু কবি প্রকৃতির ছেলে। লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতাও লেখে, কিন্তু কারুকে দেখায় না। রান্নাবান্নার মতন ব্যাপারে তার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই।

রফিক হেসে বললো, তুই কি ভেবেছিস, এখানে শুধু বসে বসে খাবি? কাজকর্ম করতে হবে!

এই সময় দরজার কাছে কার যেন ছায়া পড়লো। রফিক চমকে উঠে বললো, কে? কুণ্ঠিত মেয়েলী গলায় ডাক শোনা গেল, রফিক ভাই!

রফিক হুট করে দরজাটা খুলে ফেললো। একটা উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে, শ্যালেয়ার কামিজ পরা, হাতে একটা বড় গোল বাটি। মেয়েটির গায়ের রং ফুটফুটে, মাথার চুল ঘন কালো।

রফিক রুক্ষ গলায় বললো, তোমার এখানে কি চাই?

- মেয়েটি লাজুকভাবে বললো, আপনি আজ এসেছেন তো, তাই দেখতে এলাম।

-তুমি যখন তখন ওপরে উঠে আসো বুঝি? দরজা বন্ধ থাকে না।

-আমরা তো ছাদে কাপড় মেলতে আর উঠাতে যাই, তাই করিম ভাই সকালে আর বিকালে দরজা খুলে রাখেন।

-কেন, নিচে কাপড় শুকাতে দেবার জায়গা নেই?

-রফিক ভাই, আপনি আমাকে বকছেন?

-না, বকছি না। এখন নিচে যাও!

রফিক ভাই, আমি আপনার জন্য একটু কাবাব নিয়ে এসেছি। আমি নিজের হাতে বানিয়েছে।

-এর মধ্যেই এসব শুরু হয়ে গেছে! এসো, ভেতরে এসো!

রফিক রীতিমতন ধমক দিয়ে কথা বলছিল মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটি তবু হাসি মুখে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। খাটের ওপর সুকুমার জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে।

রফিক মেয়েটিকে বললো, এর নাম সুকু মিয়া। আমার ফুফাতে ভাই। তুমি একে আগে দেখো নি।

তারপর সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বললো,এই মেয়েটির নাম তিশ্‌না। তৃষ্ণা নয়, তিশ্‌না। ভারী ফাজিল মেয়ে।

তিশ্‌না বললো, রফিকভাই, আপনি আমাকে দেখলেই বড় বকেন।

- বকবো না! তোমার নানী বারণ করেছেন না যখন তখন আমাদের এখানে আসতে?

- নানীর এখন খুব অসুখ, বিছানা থেকে ওঠে না।

- বা বা বা নানীর এখন অসুখ , আর সেই সুযোগ নিয়ে ও এসেছে পালিয়ে! আবার কাবার বানানো হয়েছে! ঠিক আছে, এনেছো যখন, দাও দুটো প্লেটে।

তিশ্‌না রান্নাঘরে থেকে দুটো প্লেট এনে যত্ন করে কাবাব সাজিয়ে দিল। দুটো গেলাসে নিয়ে এলা ঠান্ডা পানি।

রফিক বললো, গেলাস-বর্তন সব ধুয়ে রেখো আবার। নইলে করীম ভাই আবার রাগারাগি করবে।

- করীম ভাই আমাকে কিছু বলে না।

-আগে থেকেই ভাব জমিয়ে রাখা হয়েছে! যাও তাহলে চা বানিয়ে নিয়ে এসো!

তিশ্‌না চা বানাতে চলে গেল রান্নাঘরে। রফিক কাবাব আস্বাদ করতে করতে বললো, তিশ্‌না এ বাড়ির নিচের তলায় ভাড়াটেদের মেয়ে। ভাবী ছটফটে।

সুকুমার বললো, খুব সরল মেয়েটি।

- বড় বেশী সরল। এই বয়সে মেয়েদের এত সরল থাকা ভালো না।

- আপনি ওকে বড্ড বেশি বকছিলেন।

মেয়েছেলেদের সব সময় বকে বকে ঠান্ডা রাখতে হয়। নইলে ওরা বড় বেশি লাই পেয়ে যায়। তুই ছেলে মানুষ, তুই কি বুঝবি?

- আপনি আমার থেকে ক'বছরের বড়? সাত আট বছর?

- তবু আমি অনেক পোড়া খাওয়া মানুষ। এই জীবনেই অনেক কিছু দেখেছি। যাই হোক, মেয়েটা যে হঠাৎ এসে পড়েছে, এটা আমার একটু ও ভালো লাগছে না।

- কেন?

- মেয়েদের তো চিনিস না। ওরা পেটে কোন কথা রাখতে পারে না। তুই যে একটা নতুন লোক এখানে এসে রয়েছিস, এ কথা পাঁচজনকে বলে বেড়াবে। লোকের কৌতুহল হবে। বুড়োরা দেখতে আসবে।

-আমার লুকিয়ে পড়া উচিত ছিল।

-একটা জলজ্যান্ত মানুষ সব সময় লুকিয়ে থাকতে পারে না। দরজা বন্ধ করে রাখতে হবে সব সময়করীমকে সাবধান করে দিতে হবে।

তিশ্না দু'কাপ চা দু'হাতে ধরে ব্যালেন্স করতে করতে ঢুকলোা ঘরে। বললো খেয়ে দেখুন তো, কি রকম বানিয়েছি?

রফিক চায়ে এক চুমুক দিয়েই মুখ বিকৃত করে বললো এঃ হে। একেবারে বাজে! মুখটাই খারাপ হয়ে গেল।

সুকুমার হেসে বললো, আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগছে।

তিশ্না অভিমান করে বললো, রফিক ভাই তো আমার কোনোকিছুই ভালো বলেন না!

রফিক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে চ-টা শেষ করলো। তারপর কাপটা নামিয়ে রেখে তীব্র চোখে তিশ্নার দিকে তাকিয়ে বললো, শোনো, তোমাকে একটা দরকারী কথা বলছি। আমাদের এখানে আর একদম আসবে না। আর আমার এই যে ভাইটি এখানে রয়েছে, এর কথা কারুকে বলবে না।

তিশ্নাা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, আমি কারুকে কিছু বলবো না। তাহলে আমাকে আসতে দেবেন না কেন?

- তুমি বেশি এলে তোমার পেছনের অন্য লোক আসবে।

- আমি লুকিয়ে লুকিয়ে আসবো!

- আরে, একে নিয়ে তো খুব মুশকিয়ে পড়া গেল দেখছি! আমাকে যা বলছি তাই শুনবে। বেশি বেয়াদপি করলে কান মলে দেবো!

- তিশ্নার ঝলমলে মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। দেখে মনে হলো এক্ষণি বুঝি কেঁদে ফেলবে। সুকুমার ভাবলো, তার কিছু একটা সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। কিন্তু মুখে তার কোনো ভাষা এলো না। তারপর ভাবলো, চুপ করে থাকাই তার উচিত। সে এখানে নতুন লোক, রফিকদা যা ভালো বুঝবে তাই করবে।

তিশ্না আবার মুখ তুলে দারুণ কৌতুহলের সঙ্গে দেখছে সুকুমারকে। তারপর এক সময় থাকতে না পেরে আবার জিজ্ঞেস করলো, ভাইয়ার কি হয়েছে? ভাইয়া লুকিয়ে থাকবে কেন?

রফিক ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললো, ভাইয়াকে ওর বাবাা -মা জোর করে শাদী দিয়ে দিয়েছে। ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওকে ধরে নিয়ে যেতে চায় তাই পালিয়ে এসেছে।

তিশ্না সুকুমারের দিকে তাকিয়ে ফিকফিক করে হাসতে লাগলো। বললো, ভাইয়া শ্বশুরবাড়িকে এত ভয় পায়?

- হুঁ। সবাই ভয় পায়।

- ঠিক আছে আমি কারুক বলবো না।

চায়ের কাপগুলো ওদের কাছ থেকে নেবার সময় তিশ্নার নজর পড়লো রফিকের আহত আঙুলটার দিকে।

শিউরে উঠে বললো ইস, একি হয়েছে?

রফিক বললো, ও কিছু না।দরজায় ছেঁচে গিয়েছে।

-দাওয়াই লাগনার নি? দেখি, দেখি।

- না, কিচ্ছু দরকান নেই, এমনি সেরে যাবে।

- আমাদের ঘরে দাওয়াই আছে নিয়ে আসবো?

- রফিক এবার তাড়া দিয়ে বললো, বলছি না, কিচ্ছু দরকার নেই তুমি এবার যাও, আমাদের এখন কাজের কথা আছে।

তিশ্না কাপ প্লেটগুলো নিয়ে চলে গেল। রফিক একটা সিগারেট ধরালো, সুকুমার পড়তে লাগলো সেদিনকার খবরের কাগজ। ট্রেন ডাকাতির ব্যাপারটা প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড় বড় অক্ষরে বেরিয়েছে। পুলিশ থেকে ইঙ্গি করা হয়েছে, এটা সাধারণ ডাকাতি নয়, এর পেছনে স্বদেশীয়দের হাত থাকা খুবই সম্ভব।

একটু বাদেও বাইরে মেয়েলী হাতের চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ শুনে রফিক বেরিয়ে আলো। দেখলো, দরজার কাছে দেয়ালের দিকে মুখ করে তিশ্না দাঁড়িয়ে আছে অভিমানী মুখে। চোখে জলের ধারা।

রফিক কাছে এগিয়ে এসে বললো, এই, আবার কি হয়েছে?

তিশ্না কোনো উত্তর দিল না। মুখও ফেরালো না।

- এই কি হয়েছে বলো না?

- আপনি আমাকে আজ সব সময় বকছিলেন।

-আরে এই জন্য কান্নাকাটি? তুমি কি এতই ছেলেমানুষ?

তিশ্না হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো রফিকের বুকে। সেখানে মুখ ঘষতে ঘষতে বললো, আমাকে কেন আসতে বারণ করছেন? কেন? আমি কি এতই খারাপ?

রফিক খুব সাবধানে তিশ্নাকে ছাড়িয়ে নিল নিজের বুক থেকে। তাকে একটু দুরে দাঁড় করিয়ে বললো, তুমি দেখছি সত্যি বড্ড ছেলেমানুষ আছো। এ রকম, আর কখনো করো না।

রফিকের গলার আওয়াজে এক রকমের দৃঢ়তা ছিল, তিশ্না চট করে সামলে নিল নিজকে। চোখ মুছে বললো, আমি আর কিছু চাই না। আমাকে শুধু এখানে আসতে বারণ করবেন না বলুন? আমি শুধু দেখতে আসবো।

- আচ্ছা, দিনে মাত্র একবার। কিন্তু আমি যা বলবো, তাই শুনতে হবে।

-শুনবো ঠিক শুনবো।

- এখন তাহলে ভালো করে চোখ মুছে ফেলে নিচে যাও।

তিশনা চলে যাবার পর রফিক দরজা বন্ধ করে এলো ঘরে। তার মুখখানায় ঈষৎ উত্তেজনার চিহ্ন, চট করে কোনো কথা বলতে পারছে না।

সুকুমার বললো, রফিকদা একটা কথা বলবো?

- কি?

- ঐ মেয়েটা আপনাকে খুব ভালোবাসে।

রফিক হেসে বললো, তাই নাকি? তুই কি করে বুঝলি?

- মুখ দেখেই বোঝা যায়।

- বেশী কিছু দেখে ফেলিস না যেন।

- আপনি ঠাট্টা করে কথা ঘোরাচ্ছেন।

- ওর বাড়ির লোকেরা ওর সঙ্গে আমার শাদী দিতে চেয়েছিল। আমার চাচাকে ধরেছিল খুব। আমি রাজি হইনি।

- কেন? মেয়েটা কিন্তু খুব ভালো। এত সরল।

- মেয়েটা ভালো ঠিকই। কিন্তু এখন কি আমাদের বিয়ে করার সময়? এখন কারুকে বিয়ে করা মানে তো সর্বনাশ করা। ঐ মেয়েটা কিছুতেই বোঝে না। কি যেন রবীন্দ্রাথের সেই কবিতাটি–

আমি পরানের সাথে খেলিবি আজিকে মরণ খেলা।
নিশীথ বেলা।
সঘন বরষা, গগণ আঁধার।
হেরো বারিধারা কাঁধে চারিধারা
ভীষণ রঙ্গে ভব তরঙ্গে ভাসাই ভেলা;
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন করিয়া হেলা
রাত্রিবেলা?

রফিক একটু থেমে বললো, এর পরে কি যেন?

সুকুমার এই কবিতার পরের লাইনগুলো আবৃত্তি করতে লাগলো গলা ছেড়ে।

॥ চার ॥

বেনারস এক্সপ্রেস ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এসে ঢুকলো আসানসোল স্টেশনের প্লাটফর্মে!

রতনলাল নিরঞ্জনের হাতে টিকিটটা গুজে দিয়ে বললো, যাও, উঠে পড়ো। সাবধানে থেকো।

নিরঞ্জন বললো, রতনদা, আমি না হয় পরের ট্রেনে যাবো। আপনাকে আগে তুলে দিই।

রতনলাল বললো, না না, শুধু দেরি করে কি হবে। আমারা ট্রেন একটু পরেই আসবে।

- আপনি কলকাতাতেই যাচ্ছেন তাহলে?

- হ্যাঁ।

- আচ্ছা, উঠে পড়ি তাহলে?

- ঠিক আছে। সামনের সাত তারিখে তো দেখা হচ্ছোই।

ট্রেন ছেড়ে দেবার পরও রতনলাল প্লাটফর্মে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। জানলা দিয়ে নিরঞ্জন মুখ বাড়িয়ে আছে। ট্রেন দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার পর সে পেছনে ফিরলো।

রতনলাল অত্যান্ত সাবধানী লোক। দলের ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীকেও সে নিজের গতিবিধি সব সময় জানতে চায় না। যতই বিশ্বাসী লোক হোক পুলিশের অত্যাচারে কার পেট থেকে কি কথা বেরিয়ে পড়বে কে জানে! নিরঞ্জনকে সে বললো বটে যে সে কলকাতায় যাচ্ছে, আসলে এখন সেখানে যাবে না।

সর্তক চোখে চারদিকে তাকিয়ে সে স্টেশনের বাইরে এলো। কোথাও কোনো উত্তেজনার চিহ্ন নেই। রতনলাল প্রফুল্ল মনে শিস দিতে লাগলো।

সাইকেলটায় সবে মাত্র হাত দিয়েছে, এই সময় হঠাৎ পেছনে থেকে একজন লোক জিজ্ঞেস করলো, একশো তেতাল্লিশ নম্বর সাইকিল আপকা হ্যা?

রতনলাল চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। ধুতি,সাদা শার্ট আর বুট জুতো পরা একজন লম্বা চওড়া চেহরার লোক। খুব সম্ভবত সাদা পোশাকের পুলিশ। রতনলালের উচিত ছিল আগেই লক্ষ্য করা।

লোকটা তাকে হিন্দীতে প্রশ্ন করলো কেন? ওকি তাকে হিন্দুস্থানী ভেবেছে? রতনলালের মস্ত বড় পাকানো গোঁফ দেখলে অনেকেই তা ভাবে।

এখন আর অস্বীকার করা লাভ নেই বলে সে বিনীতভাবে বললো, জী হ্যাঁ।

-চলিয়ে আপ্‌কো থানা মে জানে হোগা!

- কাহে?

ইয়ে সাইকিল থানা মে জমা দেনে পড়ে গা?

রতনলাল অবুঝের মতন নিরীহভাবে বললো, কেয়া হুয়া, কুছ নেই সমঝতা–

লোকটি বললো, একঠো বকরিকো মার দিয়া কোন্?

রতনলাল যেন আকাশ থেকে পড়লো একেবারে। দু'টি ভুরু তুলে রাজ্যের বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, বকরি মর গ্যা? ইস সাইকিল মে?

রতনলাল তখন মনে মনে নিজের হাত কামড়চ্ছে! ভোরের দিকে একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। তখন নিরঞ্জন সাইকেল চালাচ্ছিল। চালাতে চালাতে ঘুম এসে গিয়েছিল বোধ হয়। হঠাৎ সামনে এক পাল ছাগল পড়লো। ব্রেক কষতে ভুলে গিয়েছিল, হুড়মুড় করে ঢুকে গেল ছাগলের পালের মধ্যে। তারপর ধাক্কা খেয়ে দু'জনেই পড়ে গেছে সাইকেল থেকে। পড়বি তো পড় একটা বাচ্ছা ছাগলের ঘাড়ের ওপর পড়েছে ওরা সাইকের সুদ্ধ। সেটা তখন মারা গেছে।

ছাগলটার দাম চুকিয়ে দিলেই চলতো। কিন্তু সঙ্গে যে দু'জন লোক ছিল, তারা এমন চেঁচিমেচি শুরু করলা যে রীতিমতন ভিড় জমে যাবার উপক্রম । টাকা নেবার বদলে অন্যসব পাঁচ রকম কথা! অত ভিড়ের মধ্যে ওরা দাঁড়াতে সাহস করে নি। একটা ছাগলের প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান দায়িত্ব ওদের হাতে। রতনলাল তখন নিরঞ্জনকে পেছনে বাসার ইঙ্গিত করে নিজে বাই বাই করে সাইকেল চালিয়ে এসেছে। দু'একজনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতেও হয়েছিল।

কিন্তু সেই ঘটনা যে এত দূর গড়াবে তা কিছুতেই বোঝা যায়নি। সাইকেলে সাধারণত/ নম্বর থাকে না। কিন্তু সেই সাইকেলটার পেছনে যে ১৪৩ নম্বর লেখা একটা চাকতি রয়েছে, সে আগে লক্ষ্য করে নি। লোক দুটো সাইকেলের নম্বর নিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দিয়েছে। থনার লোক এত তাড়াতাড়ি কাজে নেমে পড়েছে? আমাদের থানাগুলো এ রকম চটপটে হলো কবে থেকে? বৃটিশ পুলিশের হাতে এখন এত সব জরুরী কাজ, এখনও এর মধ্যে ছাগল চাপা দেওয়া কেস হাতে নেবার সময় আছে।

লোকটা রতনলালের সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে হাত দিয়ে বললো, চলিয়ে–।

রতনলাল ঠিক মনস্থির করতে পারলো না। সামান্য একটা ছাগল চাপা কেসের জন্য থানায় যেতে তার আপত্তি থাকার কথা নয়। কিছু টাকা ফাইন দিলেই চুকে যাবে।

কিন্তু যদি কোনো কারণে ওরা তাকে সার্চ করতে চায়? তার কাছে নগদ এক লক্ষ্য দশ হাজার টাকা, একটা মাউজার পিস্তল এবং একটা বারো ইঞ্চি ছোরা আছে। এগুলো লুকোবে কি করে?

সার্চ করার কথা নয়। ছাগল চাপা দিলে কারুর বড়ি সার্চ করে না। কিন্তু দারোগার মেজাজের কথা তো বলা যায় না। যদি জিজ্ঞেস করে অত ভোরবেলা সে সাইকেলে কোথা থেকে আসছিল? সাইকেলের মালিক কে? সাইকেলগুলো সব ভাড়া করা হয়েছে ফরাসী চন্দননগর থেকে। যদি সেই ব্যাপারে খোঁজ পড়ে?

আর কিছু না, নিছক সন্দেহ বশেই যদি তাকে হাজতে আটকে রাখতে চায়, তাহলেও তো তার সঙ্গের জিনিস পত্তর বাইরে জমা দিতে হবে।

রতনলালের কপালে বিজবিজে ঘাম ফুটে উঠলো। যে কোনো কারণেই হোক, এখন তার থানায় যাওয়া চলতেই পারে না। কিন্তু এই লোকটাকে এড়াবে কি করে? আশে পাশে অনেক লোক।

রতনলাল শুনেছে, পুলিশকে ঘুষ দিলে অনেক সময় ঝামেলা এড়ানো যায়। এই রকম ছোটখাটো ব্যাপারে ঘুষ পাবার জন্য সেপাইরা তো মুখ বাড়িয়েই আছে। কিন্তু কি ভাবে ঘুস দিতে হয়, তা সে জানে না। এত লোকজনের মধ্যে এই লোকটির হাতে টাকা গুজে দিলে অন্যরা দেখতে পাবে না? এই লোকটাযদি চেঁচিয়ে ওঠে?

অগত্যা রতনলালকে যেতে হলো লোকটার সঙ্গে। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটার দু'দিকে দু'জন ধরে আছে। স্টেশনের এলাকা ছাড়িয়ে আসার পর রতনলাল পকেট থেকে পাসিং শো সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললো ।সিগারেট পিয়েঙ্গা সিপাইজী?

লোকটি গম্ভীরভাবে বললো নেহি, পিতে নেহি!

ওরে বাবা, এ লোককে ঘুষ দেওয়া যাবে কি করে? আরও কিছুক্ষণ যাবার পর জিটি রোডে এসে পড়তেই অনেক লোকজনের ভিড়। থানা খুবই কাছে।

এখানে সামান্য একটা সিদ্ধানন্তের ওপরেই জীবন কিংবা মরণ। অনেক বৃহৎ পরিকল্পনা এই রকম ছোটখাটো কারণে ফেঁসে গেছে। রতনলালের হাতে আর সময় নেই।

রতনলাল মুহূর্তে মন ঠিক করে ফেললো ।সে বললো, সিপাইজী সাইকেলটা ধরিয়ে তো। পিসাব করে গা।

লোকটাকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়ে রতনলাল প্রচণ্ড জোরে সাইকেলটা ঠেলে দিল লোকটার গায়। আচমকা ধাক্কা খেয়ে লোকটা সাইকেল সমেত পড়ে গের সেই সুযোগে দৌড়ালো রতনলাল। রাস্তা পেরিয়ে ভিড়ের মধ্যে।

লোকটা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে খানিকটা সময় লাগলো। তারপর চেঁচাতে লাগলো, পাকাড়ো, পাকাড়ো! চোর, ডাকু–

রতনলাল প্রাণ পণে দৌড়াচ্ছে। রাস্তার লোক ব্যাপারটা চট করে বুঝতে পারে নি। তারপর কয়েকজন লোক ছুটতে লাগলো তার পেছনে। পলাতককে ধরার জন্য পথে ঘাটে সব সময়ই অনেক লোক তৈরি হয়ে থাকে।

রতনলাল এক হাতে টাকার থলে আর এক হাতে পকেটের মধ্যে পিস্তলটা চেপে ধরে আছে। দরকার হলে শেষ পর্যন্ত গুলি চালাতে হবে। উপায় কি!

পাশেই একটা বাজার দেখতে পেয়ে রতনলাল তার মধ্যে ঢুকে পড়ে বেঁচে গেল। বাজারের ভিড়ের মধ্যে তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। সেখান থেকে বেরিয়েও এ গলি ও গলি দিয়ে ঘুরলো অনেকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত পেছনে অনেকক্ষণ ধরে কেউ নেই দেখে নিশ্চিত হলো।

কাছেই দেখলো রাস্তার পাশে ইটের ওপর একজন নাপিত বসে আছে ছাতা মেলে। খদ্দের নেই। রতনলাল একটু আড়ারে সরে গিয়ে খুরে ফেললো নিজের গায়ের জামাটা, সেটার সঙ্গে অন্য জিনিসপত্তর দিয়ে পুটলি বাঁধলো একটা। খালি গায়ে এখন তাকে অনেকটা দেশোয়ালি লোকের মতন দেখাচ্ছে। এবার গিয়ে সে বসলো নাপিতটার ছাতার তলায়।

রতনলালের খুব শৌখিন বাবরি চুল। সেই চুল ছেটে ফেললো খুব ছোট করে। তারপর যখন নাপিতটিকে বললো, তার গোঁফ উড়িয়ে দিতে, তখন নাপিতটি পর্যন্ত অবাক। সে বললো, বাবু, এত শখের মোচ কেটে ফেলবেন? কত লোক এ রকম মোচ চেয়েও পায় না। কত লোকের গোঁফ হয় ঝাটার কাঠির মতন।

রতনলাল বললো, আরে ভাই, পকেটে পয়সা না থাকলে কি মোচ রাখা-মানায়? তাতে মোচেরই অপমান।

নাপিতটি হেসে বললো, তা বটে!

–আমি চাকরির কথা কি করে জানাবো। আমি গরীব মানুষ।

– ভাই, তোমার সন্ধানে কোনো চাকরি আছে?

- আমি চাকরির কথা কি করে জানবো। আমি গরীব মানুষ।

-আমিও গরীব। তুমি তো অনেক বাবুদের বাড়ি-টাড়িতে যাও, যদি কোনো দারোয়ান বা চাকরের কাজ খালি থাকে–

রতনলাল অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ গল্প জমিয়ে তুললো নাপিতটির সঙ্গে।

১৯২৮ সাল। আসানসোল তখন মূলতঃ অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের শহর। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের সংখ্যা খুবই কম। রেলের অফিসার আর লাখনির সাহেবরা সেখানে ফুর্তি করতে আসে।

নাপিতটির কাছ থেকে রতনলাল একটি বস্তির সন্ধান জেনে নিল, যেখানে ঘর ভাড়া পাওয়া যায় সস্তায়। তারপর উঠে পড়লো। এখন রেল স্টেশনের দিকে যাওয়া তার পক্ষে কোনো মতেই উচিত নয়। ট্যাক্সি চেপে এখান থেকে সরে পড়া যেতে পারে। কিন্তু যদি চেকপোষ্টে পুলিশ থাকে? হোটেলে থাকলেও ধরা পড়ে যেতে পারে। একমাত্র উপায় এখানেই ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা।

বস্তির ঠিকাদারের নাম কুমার সিং বাপোট। বিরাট তাগড়া জোয়ান। রতনলাল খুঁজে বা করলো তাকে। যে কোনো একটা ঘর পেলেই তার চলবে।

কুমার সিং বাপোট প্রথমেই সন্দেহের চোখে দেখলো রতনলালকে। রতনলালের সঙ্গে কোনো জিনিষপত্র নেই। সেকি এক মাসের ভাড়া অ্যাডভান্স দিতে পারবে?

রতনলাল কাঁচুমাচুভাবে বললো, না বাপোটজী অত টাকা এক সঙ্গে তো দিতে পারবো না। আপনি সাতদিন করে নিন। এইটুকু মেহেরবাণী করুন।

কুমার সিং বাপোট জিজ্ঞেস করলো, কি কাজ করা হয়?

-কিছু না। কাজ খুঁজছি।

বাপোটজী তাকে তবু জেরা করতে লাগলো নানাভাবে। রতনলাল অবিলম্বে বুঝতে পারলো, কুমার সিং বাপোট তাকে পুলিশের লোক বলে সন্দেহ করছে।

এতে সে বেশ মজা পেল। তার মানে বাপোটজীর কোনো অবৈধ কারবার আছে। বাপোটকাজীর কথা শুনে সে এমন ভাব দেখাতে লাগলো যেন সে এক বর্ণিও হিন্দী বোঝে না।

ঘরভাড়া সাড়ে ষোল টাকা। রতনলাল পুটুলি থেকে চারটি টাকা আর একটা দু'আনি বার করে দিল বাপোটজীর হাতে। এক সপ্তাহের ভাড়া। বাপোটজী কোনো রসিদের ধার ধারেন না। সব কিছুই তার মুখে মুখে । রতনলালেরও কোনো গরজ নেই।

কথাবার্তা বলে সন্তুষ্ট হয়ে বাপোটজীর জিজ্ঞেস করলেন, রতনলাল কি রেলের পাথর ফেলা কুলীর কাজ করতে রাজী আছে?

রতনলাল যেন হাতে স্বর্গ পেল। এই কাজ পেলে সে এক্ষণি করবে। বাপোটজী বললো, তার জন্য পঞ্চাশ টাকা দস্তুরি লাগবে। এর অর্ধেক নেবে রেল কোম্পানীর কন্ট্রাকটর, আর অর্ধেক বাপোটজীর প্রাপ্য।

রতনলাল নিরাশ হয়ে বললো, ওরে বাবা এত টাকা কোথা পাবো? আচ্ছা, দেখি যদি যোগাড় করতে পারি!

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো। রতনলালের পদবী চক্রবর্তী । তার বাবা পাবনা শহরের একজন নামজাদা উকিল। রতনলাল ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংক ও সংস্কৃতে লেটার পেয়েছিল।

বস্তির ঘরখানায় কোনোরকম জিনিসপত্র নেই। আরও এক টাকা বাপোটজীর কাছ থেকে একটা খাটিয়া ভাড়া করতে হলো। তারপর মোড়ের দোকান থেকে চারখানা রুটির আর ঢেঁড়শের ঘ্যাট খেয়ে সে রতনলাল দরজা বন্ধ করে ঘুমালো। ভাল করে ঘুমোবার উপায় কি, খাটিয়াটা ভর্তি ছারপোকা। নেহাত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিল বলেই সে ঘুমোতে পারলো।

সন্ধো বেলা ঘুম ভাঙ্গার পর রতনলাল দেখলো তার ঘরের আশেপাশে কয়েকটা মুখে রঙ মাখা মেয়ে ঘোরাঘুরি করছে। রতনলাল বাইরে এসে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝলো। মেয়েগুলোর পরনে ঝ্যালঝেলে পাটের শাড়ি, গালে ছোপ ছোপ পাউডার, আর ঠোঁটে লাল রঙ। তাকে দেখে তারা মুখ মচকে হাসতে লাগলো।

রতনলাল বুঝতে পারলো, সে ঠিক জায়গায় আসে নি। এসব জায়গায় প্রায়ই পুলিশে উপদ্রব হওয়ার কথা। অবশ্য বাপোটজী পাকা লোক, তিনি কি আর পুলিশের সঙ্গে পাকা ব্যবস্থা করে রাখেন নি।

রতনলাল কিছুক্ষণের জন্য বিমর্ষ বোধ করলো। কাল সারাটা দিন ও রাত অত্যন্ত বেশি পরিশ্রম গেছে। মানসিক উত্তেজনাই পরিশ্রান্ত করে বেশি। এখন তার প্রয়োজন ছিল কয়েকটি দিনের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। সে ব্যবস্থা করাও ছিল, হঠাৎ একটা ছাগল চাপা দেবার জন্য ভন্ডুল হয়ে গেল সব কিছু। এখানে কি আর পরিশ্রম হবে! যে বস্তিতে বেশ্যা থাকে, সেখানে শান্তি থাকে না।

অনেক রাত পর্যন্ত লোকজনের আনাগোনা ও হৈ হল্লা চললো। ঘুঙুরের আওয়াজ, মেয়েদের গলায় তীক্ষ্ণ হাসি গেলাম ভাঙা। দিনের বেলা জায়গাটা ঠান্ডা থাকে রাত্রিরবেলা এখানে ঘুমোনো অসম্ভব।

প্রথম রাতটা কোনোক্রমে কেটে গেল। পরের দিনও দিনের বেলা রতনলার বাইরে বেরোলো না। পুলিশের তৎপরতা কতখানি সে জানে না। ছাগল চাপা দেওয়া ব্যাপারে ঝাম্পটা না পাকালে সে অনেক নিশ্চিন্তে থাকতে পারতো। তার খুব দরকার ছিল একটা খবরের কাগজ পড়ার- কিন্তু কোনো উপায় দেখছে না।

বিকেলে বাপোটজী এসে জিজ্ঞেস করলো, কি হে, সারাদিন বেরুলে না যে? নোকরি খুঁজতে হবে না? টাকার ধান্দা নেই বুঝি?

রতনলাল একটু বিরক্ত বোধ করলো। এই লোকটা কি বার বার এসে বিরক্ত করবে নাকি?

সে বললো, বাপোটজী, আপনাকে তো সাতদিনের ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। আপনার এত চিন্তা কিসের?

বাপোটজি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলো। যার কাছে পঞ্চাশটা টাকাও নেই, সে টাকার ধান্দায় না বেরিয়ে বসে বসে ঘুমোয় কি করে? এই জাতীয় মানুষদের সে বুঝতে পারে না।

নিজের মেজাজ সামলে রতনলাল বললো, আজ আমার শরীরটা ভালো নেই।

-দিব্যি তো বহাল তবিয়ৎ দেখছি!

বাপোটজীর সন্দেহ ঘুচলো না। সে রতনলালের ঘরের আশে পাশেই ঘোরাফেরা করতে লাগলো।

দরজা ছাড়া ঘরে আর একটি মাত্র জানালা। সেই জানালাটার আবার বন্ধ করা যায় না। ছিটকনি নেই।

ধাক্কা দিয়ে সেই জানালাটা খুলে দুটি স্ত্রীলোক মুখ বাড়িয়ে বললো, দরজাটা একটু খুলো না বাপু! গোমড়া মুখে সে আছো কেন?

মেয়েদের সঙ্গে একেবারেই মেলামেশা করার অভ্যেস নেই রতনলালের। বিশেষ করে এ কেমন ধারা মেয়ে, অচেনা লোককে যারা প্রথম থেকেই তুমি বলে সম্বোধন করে! আর এক নতুন ঝামেলা।

উঠে গিয়ে রতনলালকে দরজা খুলতেই হলো। মেয়ে দু'টি তাকে প্রায় ধাক্কা মেরে সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো। তারপর একজন আরেকজনকে বললো, এই ঘরটারই দোষ আছে, না রে? এ ঘরে যে আসে সেই কি এমনি হয়ে যায়?

অন্য মেয়েটি বললো, আমার তো বাবা এখানে ঢুকলেই ভয় ভয় করে। একলা কোনোদিন আসতে পারবো না।

রতনলাল বোকার মতন দাঁড়িয়ে রইলো।

মেয়ে দুটি বোধ হয় রতনলালের সমবয়সী হবে। কিংবা বড়ও হতে পারে, কে জানে! তাদের চেহারা ও পোশাকে অদ্ভুত অসামঞ্জস্য আছে। শাড়ি ঝলমলে, কিন্তু ব্লাউজ কোঁচকানো ও ময়লা। মুখে পাউডার কিন্তু পায়ে ছেঁড়া চটি। কণ্ঠার হাড় জেগে আছে, কিন্তু স্তন অস্বাভাবিক রকমের বড়।

মেয়ে দু'টি ওরে খাটিয়ার ওপর বসে পড়ে বেশ আপন আপন গলায় বললো তোশক নেই, বালিশ নেই, এখানে তুমি শোও কি করে? তোমার কষ্ট হয় না?

রতনলালের আর জায়গা নেই, সে দাঁড়িয়ে থেকেই বললো, বিদেশ বিভূঁয়ে ওসব কোথায় পাবো?

একজন বললো, বাড়ি থেকে কিছু আনো নি কেন? ,বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছো নাকি?

-বাড়িই নেই তো, তা পালাবো কোথা থেকে!

এই সামান্য কথা, এতেই ওরা হেসে একজন আর একজনের গায়ে গড়িয়ে পড়লো। যে মেয়েটির গায়ের রং একটু মাজা মাজা, সে বললো , জানো ভাই, এই ঘরটায় আগেও তোমার মতন একজন পরদেশী মানুষ থাকতো। ঘর থেকে বেরুতো না, কারো সঙ্গে কথাও বলতো না। ওমা, তারপর একদিন সে আপনা আপনি মরে গেল। বিষ খেয়েছিল! সেই থেকে তো এ ঘর আর কেউ ভাড়া নেয় না।

কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটি বললো, তুমিও সে রকম করবো না কি? ধরণ-ধারণ তো সেই রকমই দেখছি।

একটু রসিকতা করার জন্য রতনলাল বললো, আমি যমেরও অরুচি।

এ কথায় কিন্তু ওরা হাসলো না। মুখের ভাব এমন করলো, যেন এ আবার কি রকম কথার ছিরি?

– তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়?

একটু না ভেবে রতনলাল বললো, আমার নাম যোগেন হালদার, দুনিয়ার কেউ নেই। পাটনায় চাকরি করতাম, হঠাৎ ছাড়িয়ে দিলে –

– বাবা –মা -ও নেই।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রতনালাল বললো, না।

কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটি একটু ভুরু কুঁচকে তাকালো। তারপর বললো, আমার নাম রমলা আর এর নাম ভানুমতী।

রতনলাল বুঝলো, তৎকালীন সিনেমা-থিয়েটারের নায়িকাদের নাম থেকে এই নাম দু'টি ধার-করা। তখন এই সব নামই খুব শৌখিন হিসেবে গণ্য হতো। ওদের আসল নাম বুঁচি-পটলী ধরনের হওয়াই স্বাভাবিক।

এ কথা ও বোঝা গেল বাপোটজীই এদের পাঠিয়েছে রতনলাল সম্পর্কে ভালো করে খোঁজ খবর নেবার জন্য।

রতনলাল আর একটা জিনিস বুঝতে পারলো। এই ঘরের ভাড়া তার কাছে থেকে অত্যন্ত বেশি নেওয়া হয়েছে। এরকম একটা ঘরের ভাড়া মাসে পাঁচ সাত টাকার বেশি হতে পারে না– বিশেষত যে ঘরে অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে। এ কথায় সাড়ে ষোলো টাকা মাসিক ভাড়ায় রাজি হয়ে

যাওয়া রতনলালের উচিত হয় নি। এরা যদি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে যে তার কাছে অনেক টাকা আছে, তাহলেই বিপদ।

রমলা পা দোলাতে দোলাতে বললো, তুমি নতুন এসেছো, আমাদের উচিত তোমাকে দেখাশুনা করা। তুমি খাও কোথায়?

– হোটেলে।

– ঘরে তো দেখছি একটা কুঁজোও নেই। জলটল খেতে হয় না?

– আপনারা দিদিরা রয়েছেন। দরকার হলে আপনাদের ঘর থেকে জল চেয়ে নিয়ে আসবো।

রমনা বললো, দিদি কি গো! এ মিনসে বলে কি? এর দেখছি মুখের কোনো আড় নেই।

ভানুমতী রতনলালকে বললো, দেখি, তোমার হাতখানা দেখি! ভানুমতী রতনলালের দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিল নিজের।

রতনলাল ঠিক বুঝতে পারলো না ব্যাপারটা। অপ্রস্তুত হয়ে বললো, কি? হাত দিয়ে কি করবেন?

ভানুমতীর আর তর সইলো না। খাটিয়া থেকে নেমে রতনলালের পাশে এসে তার হাতখানা ধরলো। তারপর তার হাত ও বুকের গন্ধ। শুকতে লাগলো।

রতনলাল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার বাধা দেবার ক্ষমতা নেই যেন। এ সব তার কাছে একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা।

ভানুমতী বেশ কিছুক্ষণ গন্ধ শুকে বললো, হুঁমুখ দেখেই ঠিক ধরেছিলাম। তোমার গায়ে যে ভদ্দরলোক ভদ্রলোক গন্ধ গো–

রতনলাল তাকে বাধা দিয়ে একটা কিছু বলতে গেল–

ভানুমতী বললো, ওসব আমার কাছে লুকাতে পারবে না। অনেক পুরুষমানুষ ঘেঁটেছি তো। ভদ্দরলোকদের গায়ের গন্ধ আলাদা। সে ঘেমো গা হোক আর যাই হোক।

রমলা বললো, ভদ্দরলোকের ছেলে তো এই বস্তির মধ্যে ঘর ভাড়া করে আছো কেন'

রতনলাল একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, টাকা পয়সা যার না থাকে সে আবার ভদ্দরলোক কি?

-আহা, টাকা পয়সা এখন না থাকুক, পরে আবার হবে। তা বলে কি আনন্দ ফূর্তি করবে না? এরকম একলা ঘেঁড়ে হয়ে ঘরের মধ্যে সব সময় বসে থেকো না। আমাদের ঘরে চলো–

–সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, আমার কাছে পয়সা নেই। আমি আপনাদের কোনো কাজে লাগবো না।

– পয়সা পরে দিও। চেহারাখানা তো বাপু তোমার বেশ আছে।

– কিন্তু আমার অসুখ আছে।

– কি অসুখ?

– খুব খারাপ অসুখ।

ভানমতী ও রমলা আবার হেসে গড়াগড়ি যায়। রতনলালের কোনে কথাই তারা বিশ্বাস করেনি। একজন বললো, আহা ঢং করো না। পয়সা নেই বলে লজ্জা পাচ্ছো তো? ভদ্দরলোকদের পয়সা না থাকলেও অনেক অনেক কিছু থাকে। মরা হাতী লাখ টাকা।

ভানুমতী রতনলালের হাত ধরে টানলো।

রতনলাল দু'এক মুহূর্তে মনস্থির করে ফেললো। যস্মিন দেশে যদাচারঃ! এখানে যখন এসেই পড়েছে, এদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে হবে। বেশী কঠোর হলে টিকে থাকা মুশকিল হতে পারে।

সে বললো, আপনাদের ঘরে তো সন্ধেবেলা নাচ-গান হয়। আমি সেখানে তবলা বাজাতে পারি। ছোটবেলায় আমি তবলা শিখেছিলাম।

রমলা হাসতে হাসতে বললো, নাচ-গান! হায় হায়, নাচ-গান জানলে কি আর এ পোড়া ছাই বস্তিতে পড়ে থাকতাম। কলকাতা কিংবা লক্ষ্মৌ চলে গিয়ে অনেক বেশি পয়সা কামাতে পারতাম।

- তুমি বুঝি নাচ-গান ভালোবাসো?

– না, না তবে ঘুঙুরের শব্দ শুনতে পাই কি না?

– সে কি নাচ নাকি গো! সেতো খ্যামটা! এখানে নাচ গান বোঝার মতন মানুষ কি আসে?

ভানুমতী বললো, হোক না আজ একটু নাচ-গান। থিয়েটারের মেয়েদের মতন অত ভালো না পারলে ও একটু একটু তো পারি।

তাই ঠিক হলো। মেয়ে দুটি তখনকার মতন চলে গেল ঘর থেকে। যাবার আগে ভানুমতী পেছন ফিরে বিচিত্রভাবে তাকিয়ে এমন ভ্রুভঙ্গি করলো, যার মানে বুঝতে পারলো না রতনলাল।

রাত আটটার কিছু পরে একজন লোক এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল ভানুমতীর ঘরে। সেখানে আজ ভালো আসর বসেছে। যোগাড় হয়েছে ঘুঙুর হারমোনিয়াম আর তবলা। তবলাটা আবার বাঁধা নেই সুরে। সাত আট বছরের মধ্যে রতনলাল। একবার ও হাত দেয়নি তবলায়। তবে স্কুলে পড়ার সময় তার বাজানোর অভ্যেস ছিল। আর এক কাকা সেতার বাজাতেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করতে শিখেছিল রতনলাল।

হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে তবলটা ঠিক করে কয়েকটা চাঁটি দিতেই রমলা উঠে দাঁড়ালো। সাত-আট জন লোক এবং স্বয়ং বাপোটজী সেখানে আজ রঙ্গরস দেখতে উপস্থিত। মদের বোতল এবং গেলাস উপস্থিত।

রতনলালকেও মদ এগিয়ে দিয়েছিল একজন, রতনলাল প্রত্যাখ্যান করেনি, পাশে এনে রেখেছে।

রমলা ঘুঙুর বাজিয়ে নাচ শুরু করেছে। নাচ মানে একটা ধেই ধেই ব্যাপার আর কি। মেয়েটি কিছুই নাচ জানে - না রতনলাল অনেক চেষ্টা করেও লয় রাখতে পারছে না। কোনো মতে ঠেকা দিয়ে যেতে লাগলো। মেয়েটি নাচের নাম করে বিলোল লাস্যে অঙ্গ দোলাচ্ছে, হাবভাবে ফুটিয়ে তুলছে নির্লজ্জতা, মিনিটে মিনিটে আঁচল ওড়ানো আর শাড়ী উঁচু করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

রতনলাল মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে বাজাতে লাগলো। এ দৃশ্য সে সহ্য করতে পারে না। তার গা গুলিয়ে উঠেছে। অন্যরা কিন্তু মদের ঝোঁকে এরই তারিফ করছে খুব।

এরপর নাচতে উঠলো ভানুমতী। আর তবু কিছুটা তাল লয় জ্ঞান আছে। কিন্তু শরীরটা বেশী ভারী। হাত পা দ্রুত চলে না। তাছাড়া শ্রোতাদের অনুরোধে ওকে ঘন ঘন কোমর দোলাতে হচ্ছে। ওরই মধ্যে একজন আবার উৎকট গলায় একটা গান শুরু করলো।

শ্রোতাদের সংখ্যা বাড়ছে। এই বস্তির সন্ধ্য অতিথিরা আজ একটা নতুন মজা পেয়েছে। অন্য ঘরের মেয়েরাও ক্রমে ক্রমে ভিড় করলো এখানে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেলেল্লা হৈ-হল্লা বাড়াতে লাগলো।

রতনলালের দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে এখানে। তার খুব মন খারাপও হয়ে যাচ্ছে। এই তার দেশের মানুষ। এরা বোধ হয় জানেই না, এদেশ পরাধীন। মাতৃভূমির কলঙ্কমুক্ত করার জন্য এরা কোনো দায়িত্ব অনুভব করে না। এরা যেন অন্ধ ও বধির। কিংবা শিশুর মতন আত্মবিস্মৃত। এখনো কত কাজ বাকী আছে।

পুরোনো শ্রোতারা এক একজন এক একটি মেয়ের হাত ধরে বাইরে চলে যাচ্ছে, নতুন শ্রোতারা আসছে। যারা রতনলালকে চেনে না কিংবা তবলার কিছুই বোঝে না, তারাও রতনলালকে ধমকে বলছে, এই ছেকরা ঠিকসে বাজা!

যেন সে সাধারণ একজন ভাড়া করে তবলচি। ওরা শুধু জানে তবলচিদের মাঝে মাঝে এরকম করতে হয়।

রতনলাল সেখান থেকে ওঠে পড়ার সুযোগ খুঁজছিল। হঠাৎ শ্রোতাদের মধ্যে একজনকে দেখে সে দারুণ চমকে উঠলো। আসানসোল ষ্টেশনের সেই লম্বা চওড়া লোকটা, যে তাকে ছাগল চাপা দেওয়ার অভিযোগে থানায় নিয়ে যেতে এসেছিল।

রতনলাল মুখ নীচু করে ফেললো। লোকটা কি তাকে চিনতে পারবে? গোঁফ কামিয়ে ফেলেছে, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা -এখন তাকে চেনা শক্ত। লোকটা তাকে কতটুকু

সময়ই বা দেখেছে। কিন্তু পুলিশের লোককে টিক বিশ্বাস করা যায় না। পুলিশের লোকও কি এরকম বে-আইনী পাপের জায়গায় ফুর্তি করতে আসে? না কি ওর কোনো অন্য উদ্দেশ্য আছে?

লোকটা কি বিশেষভাবে নজর রেখেছে রতনলালের ওপর, তাও ঠিক মনে হয় না। খানিকটা ঢুল ঢুলু চোখে বসে দু'হাতে তাল দিচ্ছে। রতনলাল ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠলো। ছাগলটা চাপা দেবার পরই তার ভাগ্যটা খারাপ হতে শুরু করেছে।

রতনলাল একবার কোমরে হাত দিয়ে অনুভব করলো, পিস্তলটা ঠিক আছে কি না। সেই মুহূর্তে ভানুমতীর দিকে তার চোখ পড়ল। ভানুমতী কি যেন ইশারা করলো তাকে। এটাও বুঝতে পারলো না সে। টাকাগুলো ঘরে মধ্যে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। এখানে আর কিছুতেই থাকা চলে না।

সে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালো পুলিশের লোকটির দিকে। মাঝে মাঝেই লোকটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছে। লোকটি আশা তাকে চিনতে পারার কোনো ভাব দেখাচ্ছে না- তবু রতনলালের মনে হচ্ছে, লোকটি যেন ঠিক মাতাল নয়, ভান করছে মাতাল হওয়ার। লোকটি কি অপেক্ষা করছে আরও লোকজন এসে পড়ার? যতই চেষ্টা করুক, রতনলালকে ওরা জীবন্ত ধরতে পারবে না। কিন্তু টাকাগুলোর কি হবে?

নাচ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন রমলা তার কপালের উপর মদ ভর্তি গেলাস রেখে ব্যালান্সের খেলা দেখাচ্ছে, এর সঙ্গে কিভাবে তবলা বাজাতে হয় তা রতনলাল জানে না। সে হাত গুটিয়ে বসেছিল। এক সময় বললো, আমি একটু বিড়ি খেয়ে আসছি বাইরে থেকে। এই বলে উঠে পড়লো।

বাইরে বেরিয়ে সে কাদা প্যাচপেচে গলিটা দিয়ে হন হন করে আসছিল নিজের ঘরের দিকে। সবে মাত্র দরজাটা খুলতে যাবে; এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। দেখলো, ভানুমতী।

ভানুমতী তীক্ষ্ম গলায় বললো, তুমি কে, সত্যি করে বলো তো?

রতনলাল বিস্ময় গোপন করে বললো, এখনো বুঝলে না। আমি একজন সাধারণ গরীব মানুষ। ফুর্তি করার পর্যন্ত মুরোদ নেই।

–আমার কাছে লুকিয়ে না।

– কিছু লুকোইনি তো।

– তুমি বিপদে পড়বে। বাপোটজীকে তুমি চেনে না।

রতনলাল দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। মোমবাতি জ্বালিয়ে বললো, ভেতরে আসুন।

ভানুমতী ভেতরে ঢুকে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। তার কৌতূহল খুবই জাগ্রত।

রতনলাল জিজ্ঞেস করলো, একরম কথা বলছেন কেন? আমি কি করেছি?

–বিকেলে যখন আমি এসেছিলাম তখন তোমার ঘরে আমি একটা জিনিস দেখেছি।

– জি জিনিস?

- যে পুঁটলিটা দিয়ে তুমি বালিশ করেছো, তার নিচে একটা পিস্তল ছিল। একটু আগেও তুমি কোমরে হাত দিয়ে দেখছিলে। তোমাকে ভালো লেগেছে বলেই একটা কথা জানতে এসেছি। এখানে বন্দুক পিস্তলের কারবার করতে যেও না। বাপোটজীর নিজের মস্ত বড় দল আছে। তুমি ওদের সঙ্গে পারবে না।

–আপনি এখানে একটু বসুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

– না, আমি আর বসবো না। আমার বুঝি রোজগারপাতি নেই। তুমি আমাকে এত আপনি আজ্ঞে করছো কেন?

– আমার একটা দিদি ছিলেন, অনেকটা আপনার মতন দেখতে। তাই আপনাকে আমার দিদির মতন মনে হয়।

–ভদ্দরলোকের ছেলে হয়েও চুরি-ডাকাতির লাইনে এসেছো কেন? এ সব লাইন তোমাদের জন্য নয়।

–তার আগে আপনি একটা কথা বলুন, আপনি আমাকে সাবধান করতে এসেছেন কেন? আমার কোনো বিপদ হলেই বা আপনার কি এসে যায়?

– কি জানি বাপু, তোমাকে দেখলেই মনে হচ্ছিল, তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। কেন সাধ করে এ লাইনে এসেছো?

–দিদি আপনাকে একটা কথা বিশ্বাস করে বলছি। আমি চোর বা ডাকাত নই। আমি একজন দেশের কর্মী। আমরা ইংরেজকে এ দেশ থেকে ডাড়াতে চাই। আপনি শোনেনি আমাদের কথা?

–গান্ধী বাবার চ্যালা?

–ঠিক গান্ধী বাবার শিষ্য না হলেও আমরা ঐ একই রকম কাজ করছি। বিশেষ কারণে আমাকে দু'একদিনের জন্য এখানে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে।

ভানুমতি খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ফ্যাকাশে ভাবে বললো, তোমাদের তো দেখলেই পুলিশে মারবে। এই কি লুকোবার জায়গায়?

– কেন, এখানে পুলিশ আসে?

- সে পুলিশ এলেও বাপোটজী হাত করে ফেলবে। কিন্তু এসব জায়গা কি তোমাদের মানায়? তোমরা হলে সব দেব রিত্র।

আমি কালকেই চলে যাবো। আপনার ঘরে কি আজ কোনো পুলিশের লোক এসেছেন।

- আমার ঘরে? কক্ষনো না?

–আপনি আমার কথা কারুকে বলবেন না। আপনাকে এইটুক বিশ্বাস করতে পারি তো?

আমার কি দায় পড়েছে লোককে বলার? কিন্তু তোমার কথা সত্যি তো?

–দিদি আমি আপনার গা ছুঁয়ে এ কথা বলতে পারি।

-ওমা ছি ছি, এ কথা শুনলে যে পাপ হয়। তোমার মতন লোক আমার পায়ে হাত দেবে কি?

হঠাৎ কেঁদে ফেললো ভানুমতী। কি জন্য সে কাঁদলো, সেই জানে। আবার চোখের জল মুছে বললো, আমি যাই, নইলে আমাকে ওরা খুঁজবে। তুমি সাবধানে থেকো।

ভানুমতী চলে যাবার পর রতনলাল ঠিক করলো, আর এখানে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। এই রাত্রির অন্ধকারে সরে পড়াই ভালো। একটু বিপদের ঝুঁকি থাকলেও তাকে সেই ঝুঁকি নিতেই হবে।

কিন্তু এর পর অসম্ভব তাড়াতাড়ি অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। রতনলাল টাকাগুলো কোমরে বেঁধে নিয়ে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় বাপোটজী আর তিনজন গুণ্ডা মতন লোককে নিয়ে ঘরে ঢুকলো এবং কোনো কথা না বলে সেই তিনজন রতনলালকে জড়িয়ে ধরলো।

বাপোটজী বললো, তোমার কাছে কি কি মাল আছে সব বার করো! আমার চোখে ধুলো দেবে ভেবেছো?

রতনলাল খুব বড় করে দম নিলো। এতে সে ভয় পায়নি। তার গায়ের জোরের কথা এরা জানে না। এক ঝটকায় সে এই তিনটে লোককেই ছাড়িয়ে নিয়ে কোমর থেকে পিস্তলটা বার করে নিতে পারে। তারপর গুলি চালিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া শক্ত নয়। কিন্তু অনর্থক গোলমালের মধ্যে গিয়ে লাভ নেই। নিতান্ত বাধ্য না হলে এবং পুলিশের সঙ্গে লড়াই ছাড়া সে গুলি খরচ করতে চায় না। অনেক কষ্ট করে এসব জোগাড় করতে হয়।

রতনলাল ঠান্ডা গলায় বললো, আমাকে ছেড়ে দিতে বলুন। আমি সব বলছি।

বাপোটজী বললো মাৎ ছোড়ে দিতে বলুন। আমি সব বলছি।

বাপোটজী বললো, মাৎ ছোড়ে। ঠিকসে পাকড়ো।

রতনলাল এবার দাঁতে দাঁত ঘষে তীব্রভাবে বললো, শুয়োরের বাচ্চা, বেশি সাহস হয়েছে তোমার। আমার গায়ে হাত দিতে এসেছেঅ। বেশি চালাকি করলে আমার দলের লোক তোমার বস্তিকে সব জ্বারিয়ে দেবে। তুমি চেনো না আমাকে।

বাপোটজী নিজের হাতে পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে তাগ করে বললো, এই, ছাড়তো। কি বলে শুনি।

লোকগুলো রতনলালকে ছেড়ে দেবার পর সে বাপোটজীকে হুকুমের সুরে বললো, পিস্তল নামাও। ওসব আমাকে দেখাবার দরকার নেই। আমাকে ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না। তোমার মতন কয়েক ডজন লোককে আমি চার্কি ঘোরাতে পারি। আমার হাতে বেশি সময় নেই, খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটা কথা বলে নিচ্ছি। শোনো, তুমি আমি তোমার এই তিনজন লোক, এই বস্তির সবাই-আমরা একই দেশের মানুষ। ঠিক কি না?

বাপোটজী চুপ করে রইলো।

রতনলাল বললো, আমরা কেউ বাঙ্গালী, কেউ বিহারী বা কেউ ইউ পি থেকে এসেছি–কিন্তু এগুলো দেশ নয় আমাদের সকলের এক দেশ, তার নাম ভারত। আমাদের মধ্যে কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান, কেউ খৃষ্টান, তবু আমরা সেই এক দেশের মানুষ। এখন আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করার সময় নয়। এখন ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের লড়াই। আমাদের সকলকে এক কাঠঠা হয়ে সেই লড়াই চালাতে হবে।

বাপোটজী অস্ফুট গলায় বললো, স্বদেশীয়! আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

-হ্যাঁ আমি তাদেরই লোক।

–স্বদেশীয়াদের সঙ্গে আমাদের কোনো করবার নেই। ভাগে হিয়াসে!

-শোনো আমি তোমাদের সাহায্য চাই।

-ওসব বাতচিত ছাড়ো। তুমি যাও এখান থেকে।

- তোমরা গোপনে বন্দুক পিস্তল কেনাবেচা করো আমি জানি। সে রকম কিছু অস্ত্র আমাদের জোগাড় করে দাও। তার বদলে টাকা পাবে।

অন্য তিনজনের মধ্যে একজন বললো, সর্দার স্বদেশীয়াদের সঙ্গে আমাদের কারবারের দরকার নেই।

বাপোটজী বললো, সে আমি জানি। এরা সব ঝঞ্ঝাটিয়া লোক। এরা পিছনে পিছনে পুলিশের ফেউ আসে।

-শোনো বাপোটজী, পুলিশ তোমাদেরও সুযোগমত পেলে ছাড়বে না। আমরা পুলিশের ভয় পাই না, তোমরা পাবে কেন? তাছাড়া এটা দেশের কাজ। তোমার নিজের দেশের জন্য তুমি এইটুকু করবে না?

- ওসব বড়কা বড়কা বাত ময়দানমে যাকে বলো। আমাদের এখানে কেন ঝামেলা করতে এসেছো?

-ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। যদি পুলিশে খবর দিয়ে আমাকে ধরিয়ে দাও, তাহলে বিপদ আছে তোমার। একজন স্বদেশীকে ধরিয়ে দিলে অন্য স্বদেশীরা তার বদলা নেয়। তোমাকে সাবধান করে দিলাম।

-স্বদেশীদের সঙ্গে যেমন আমাদের কারবার নেই, তেমন পুলিশের সঙ্গেও আমার কারবার নেই।

–আমি ধরা পড়লে তুমিও খতম হয়ে যাবে।

-আরে বাবা, ভাগো না হিয়াসে। আভি ভাগ যাও।

এমন সময় বাইরে হুইশেল-এর শব্দ শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ একটি ছেলে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে বললো, পুলিশ!

বাপোটজী আর তার সঙ্গীরা চক্ষের নিমেষে ঘর থেকে বেরিয়ে উধাও হয়ে গেল।

রতনলাল দু'এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বুঝে নিল অবস্থাটা। ঘন ঘন হুইশেল-এর শব্দ ভেসে আসছে চর্তুদিক থেকে–তাতে মনে হয় পুলিশের প্রস্তুতিটা বড় রকমের। নিতান্ত একটা ছাগল চাপা দেওয়া সাইকেল আরোহীকে ধরতে আসার ব্যাপার নয়। বস্তির চারদিক ঘিরে ধরে আস্তে আস্তে এগোবে।

রতনলাল দৌড়ে চলে এলো ভানুমতীর ঘরে। ঘর এখন ফাঁকা। তাকে দেখে ভানুমতী বললো, একি?

রতনলাল দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললো, আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। আপনার কাছে আমি কিছু টাকা রেখে যাবো আপনি লুকিয়ে রাখতে পারবেন?

-কত টাকা?

-এক লক্ষ দশ হাজার।

-অত টাকার অঙ্ক শুনে ভানুমতীর প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো অবস্থা। সে বললো, অত টাকা? আর তুমি বলছিলে, তোমার কাছে টাকা নেই।

-অত কথা এখন বলার সময় নেই। ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি, এই টাকা কোনো খারাপ কাজের জন্য আমার কাছে ছিল না। এটা আমাদের দেশের লোকের টাকা। এর প্রতিটি পাই-পয়সা পর্যন্ত দেশের কাজের খরচ হবে। এটা আপনার কাছে এখন রাখুন।

-এত টাকা আমি কোথায় লুকিয়ে রাখবো?

-আপনার কাছে এত টাকা আছে, কেউ সন্দেহ করবে না। সেই জন্যেই আপনার পক্ষে রাখা সুবিধে। আর যদি বেঁচে থাকি, আমি ফিরে এসে টাকাটা নিয়ে যাব। আমি যদি মরে যাই, তাহলে টাকাটা কলকাতার এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। আপনি যদি টাকাটা না দিতে চান, সে আপনার ধর্ম। তবু দেশের কথা মনে রাখবেন। আমি যাচ্ছি।

-শোনো, শোনো তুমি ছাড়া এ টাকা অন্য কারুর হাতে কখনো দেবো না।

-আমি মরে গেলেও টাকাটা দেশের কাজে লাগাবার চেষ্টা করবেন। সেই জন্যেই কলকাতার ঐ ঠিকানার দিলাম। টাকাটা আমার সঙ্গে থাকলে পুলিশ আমাকে ধরার সঙ্গে সঙ্গে টাকাটাও নিয়ে যাবে। তাই আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি।

-তুমি মরবে না, তুমি কিছুতেই মরবে না।

ভানুমতী ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। কিন্তু সেদিকে তাকাবার আর সময় নেই রতনলালের। খোলা পিস্তল হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

বস্তির পেছন দিকে মস্ত পুকুর আছে, সেটা রতনলাল আগে দেখে রেখেছিল। এখন দ্রুত চলে এলো সেদিকে। পুকুরের ধারে একজন মাত্র লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে পুলিশ কিংবা অন্য লোক তা যাচাই করার আর সময় নেই। রতনলাল গুঁড়ি মেরে এসে বাঘের মতন ঝাঁজিয়ে পড়লো তার ওপরে। পিস্তলের হাতল দিয়ে উপর্যুপরি কয়েকবার ঘা মারলো তার মাথায়। এক হাতে লোকটার মুখ চেপে ধরেছিল।

লোকটা অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়তেই রতনলাল নিঃশব্দে নেমে পড়লো দিঘিটাতে। অন্ধকারে কালো জলের মধ্যে শুধু মুখ ও একটা হাত তুলে বুক-সাঁতার কেটে এগোতে লাগলো অন্যদিকে।

॥ পাঁচ ॥

সব্যসাচীর কাঁধের ক্ষতস্থানে সেপ্‌টিক হয়ে গেছে, কয়েকদিন ধরেই তার খুব জ্বর। ওঠার শক্তি নেই।

পরিকল্পনা ছিল যে, অরিন্দম সব্যসাচীকে মাত্র একটা দিন তার দিদির আশ্রয়ে রাখবে। তারপর সব্যসাচীর ফরাসী চন্দননগরে আশ্রয় নেবে। দলের মধ্যে একমাত্র সব্যসাচীর পুলিশ রেকর্ড আছে। বরিশাল টাউনে সত্যগ্রহ করতে গিয়ে সে একবার সাত দিনের জন্য জেল খেটেছিল। তা ছাড়া, কাশীপুর বোমার মামলায় পুলিশ তার যোগাযোগ ধরে ফেলেছিল, অন্য আর

সাত জনের জেল এবং দ্বীপান্তর হলেও সব্যসাচী সেবার ধরা পড়ে নি, তার নামে, এখনো ঝুলিয়া ঝুলছে। সুভাষবাবু তাকে আত্মগোপন করে থাকার অনুরোধ করেছিলেন, তবু সব্যসাচী এই ট্রেন ডাকাতির অ্যাকশনে নিজের থেকেই এসেছে। পুলিশ যদি এর সঙ্গে তার যোগসূত্র একবার অনুমান করতে পারে–তা হলেই তার ছবি ও বর্ণনা সমেত ইস্তাহার বেরিয়ে যাবে।

রতনলালও আগের কয়েকটিতে অংশ নিয়েছে বটে, কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। সুতরাং পুলিশের কাছে সে এখন পর্যন্ত অচেনা।

অরিন্দম বেশ বিপদে পড়েছে সব্যসাচীকে নিয়ে। তার জামাইবাবু সরকারী অফিসার। তাঁর বাড়িতে এরকম বিপজ্জনক আসামীকে লুকিয়ে রাখতে কতদিন সম্ভব? যদিও তার মেজাদির পুরোপুরি সমর্থন আছে তাদের দিকে, কিন্তু জামাইবাবু সে কথা ঘুনাক্ষরেও জানেন না। সব্যসাচীকে তো এখন কোথাও নড়নোও অসম্ভব।

ডাক্তার ডাকতে পারা যায়নি। যদিও স্থানীয় ডাক্তারটি কুন্তলার বান্ধবীর বাবা, কিন্তু তিনি খুব গোঁজা রাজভক্ত বলে শোনা গেছে। এখন একটু ঝুঁকি নেওয়া যায় না। অরিন্দমের জামাইবাবু এসে পড়লে যে কি হবে সেও আর এক কথা।

একতলার ঘরে হঠাৎ বাইরের লোক এসে পড়ে দেখে ফেলতে পারে বলে সব্যসাচীকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হয়েছে তিন তলার ঘরে। তিন তলার এই একটি মাত্র ঘর, বাকিটা ছাদ।

কুন্তলা সব্যসাচীকে ব্যাণ্ডেস বদলে দিতে এসেছে। সব্যসাচী আজও জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন। তার কপালে জলপট্টি লাগানো।

কুন্তলা প্রথমে জলপট্টিটা ভিজিয়ে দিল। তারপর ব্যাণ্ডেজটা খুলতে লাগলো। পুঁজ ও রক্তে ব্যাণ্ডেজটা নোংরা হয়ে গেছে।

গরম জল দিয়ে ঘষে ঘষে তুলোটা পরিষ্কার করার সময় সব্যসাচী যন্ত্রণায় চোখ মেলে তাকায়। চোখের সামনে সে দেখে একটি যুবতীর মুখ, তবু সে অস্ফুট গলায়, বলে, অরিন্দম অরিন্দম।

কুন্তলা বললো, অরিন্দম নিচে আছে। ডাকবো।

-হ্যাঁ ডাকো।

-আচ্ছা এই জায়গাটা আগে পরিষ্কার করে দিই।

-সব্যসাচী আবার ভালো করে চোখ মেলে মেয়েটিকে দেখে। তারপর জিজ্ঞেস করে, তুমি কে?

-আমার নাম কুন্তলা। কালকে যে আমার সঙ্গে কথা বললেন?

-কালকে? কালকে আমি কোথায় ছিলাম?

এখানেই তো।

-এখানে মানে? এটা কোন জায়গা?

-এটা আমাদের বাড়ি।

-আমাদের মানে কাদের?

কুন্তলা একটু হেসে বললো, এই সব কথাই কিন্তু কালকে বলেছি। আপনার একটুও মনে পড়ছে না?

-তুমি অরিন্দমকে ডাকো। লক্ষ্মী মেয়ে, কথা শোনো তো।

কুন্তলা উঠে গিয়ে অরিন্দমকে ডেকে নিয়ে এলো। অরিন্দমের মুখখানা দারুন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এখন সেই ভাবটা গোপন করে বললো, কি রে আজ কেমন আছিস?

সব্যসাচী বললো, অরিন্দম, আমরা এখানে কি করছি? আমাদের তো এখনো অনেক কাজ বাকী আছে।

অরিন্দম একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো, তা তো অনেক কিছুই বাকী আছ। তুই যে উঠতে পারছিস না!

-আমি ভালো হয়ে গেছি। আমি ঠিক যেতে পারবো।

-তোর গায়ে এখনো একশো চার ডিগ্রী জ্বর।

-ওতে কিছু হবে না। আমি খালি গায়ে কেন? আমার শার্টটা কোথায়?

সব্যসাচী উঠতে যাচ্ছিল, কুন্তলা তাকে এক ধমক দিয়ে বললো, কি করছেন কি?

চুপ করে শুয়ে থাকুন তো!

সব্যসাচী অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বললো, এই মেয়েটি কে রে? এ আমার সব সময় ব্যথা লাগিয়ে দেয়? আঃ।

অরিন্দম বললো, ব্যথা লাগিয়ে দেয় কি রে? ওই তো তোকে বাঁচিয়ে তুলছে।

কুন্তলা বললো, আমি আপনাকে ব্যথা লাগিয়ে দিই? ঠিক আছে, আরো বেশী করে ব্যথা লাগবো। এইবার?

কুন্তলা শক্ত করে ব্যাণ্ডেজের বাঁধন দিতে সব্যসাচী যন্ত্রণায় আ-আ করে উঠলো। তারপর বললো, আমাকে কি মেরে ফেলতে চাও।

-তাহলে যে বললেন, আপনি সব কিছু করতে পারবেন এখন?

সবসাচী তার সুস্থ হাতখানা উচুতে তুলে ধরলো। তারপর বললো, একটা হাত তো ঠিকই আছে। এক হাতে আমি অনেক কিছু করতে পারি। এই জ্বরটা এলো কোথা থেকে?

-তোর আঘাতটা বড্ড বেকায়দায় লেগেছিল।

-আমাকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যেতে হবে।

- সেই চেষ্টাই তো হচ্ছে।

-অরিন্দম তুই আমার ওপর রাগ করিস নি তো?

-না, না।

সব্যসাচী কুন্তলাকে বললো, আমাকে একটু ধরো তো ভাই!

-কে? আবার কি করতে চান?

-গদিওয়ালা খাটে শুয়ে থেকে মেয়েলি হাতের সেবা ভোগ করবো, এই ভাগ্য নিয়ে তা আমরা জন্মাই নি!

-আপনি বড্ড বড় বড় কথা বলেন।

সব্যসাচী একটু চুপ করে গেল। দুঃখিতভাবে তাকালো অরিন্দমের দিকে। বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বললো, অরিন্দম, আমি নিজেকে খুব অপরাধী বোধ করছি। তোর দিদি-জামাইবাবুর ঘাড়ে চেপে থাকার ইচ্ছে আমার একটুকুও নেই।

অরিন্দম শুকনোভাবে বললো, তা আর কি করা যাবে। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট।

-আর কারুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?

-না। এখানে বেরোই নি।

-রতনলালের কাছে যে করেই হোক একটা খবর পাঠাতেই হবে।

-দেখি।

তারপর দুই বন্ধু মুখোমুখি চেয়ে বসে রইলো। ওরা অনেক কথা ভাবলো। ট্রেন ডাকাতির জন্য একটু যেন অপরাধ বোধ জেগেছে মনে। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, চুরি-ডাকাতিকে এখনো, কোনো শুভ উদ্দেশ্যের জন্য হলেও–মন থেকে সমর্থন করতে পারে না। বোমা-পিস্তল নিয়ে মানুষ খুন করার একটা যুক্তি পেয়ে গেছে অবশ্য গীতা থেকে অর্জুনাকে কৃষন যে সব বাছা-বাছা যুক্তি শুনিয়েছিলেন।

ডাকাতির টাকায় ওর ভেবেছিল কিছু ডিনামাইট কিনবে। সেগুলো পাঠাতে হবে পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা অনেক আশা করে আছে। পাঞ্জাবে পুলিশ এখন নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে। এর একটা পাল্টা জবাব না দিতে পারলে সাধারণ মানুষের মনোবল একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতেই হবে কয়েকজনকে।

কিন্তু কিছুই করা যাবে না। টাকার বান্ডিল বালিশের তলায় রেখে শুয়ে আছে সব্যসাচী। অপরের টাকা ডাকাতির টাকা। ভাবলেই একটু গা ঘিনঘিন করে।

অরিন্দমের জামাইবাবু রমেশ মিত্র ট্যুর থেকে ফিরলেন পরের দিন। অরিন্দমকে দেখে তিনি একটু বিব্রত বোধ করে। তিনি শান্তি প্রিয় মানুষ। সরকারের সঙ্গে কোনো প্রকার গন্ডগোলের মধ্যে যেতে চান না। মাথা গরম ছেলে -ছোকরারা পুঁচকে পুঁচকে অস্ত্র নিয়ে মহাশক্তিশালী ইংরেজকে তাড়াবার স্বপ্ন দেখছে। কিস্যু হবে না। শুধু নিজেরা মরবে আর -মাকে জ্বালাবে।

শ্যালক হচ্ছে বড় টুকুম, সে বাড়িতে এলে যত্নটুত্ন করতেই হয়। তাকে তো আসতে বারণ করা যায় না। কিন্তু হঠাৎ এই সময় এসে উপস্থিত হয়েছে কেন, কে জানে। ওর সঙ্গে রাজনীতির যোগ আছে তিনি জানেন।

অরিন্দমের জামাইবাবুকে সব্যসাচীর কথা জানানোই হলো না।

অরিন্দম তাকে বললো, জামাইবাবু আমি এসেছি চাকরির সন্ধানে। একটা চাকরিবাকরি না পেলে আর চলছে না। যতদিন না পাচ্ছি, ততদিন দিদির বাড়িতে থেকে অন্ন-ধ্বংসে করবো ঠিক করেছি।

রমেশ হেসে বললেন, কেন, তোমার দেশোদ্ধারের কাজ কি হলো?

–এখন একটু থেমে আছে। খেয়ে দেয়ে কিছু একটু গায়ের জোর করে নিই, তারপর আবার দেখা যাবে।

–ইংরেজদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবে?

–না পারি, যুযুৎসুর প্যাঁ মারবো। তাতে অনেক পালোয়ানও ধরাশায়ী হয়ে যায়।

–কিন্তু ব্রাদার, এসব মতলব থাকলে তো চাকর করা যায় না। কে তোমাকে চাকুরি দেবে বলো!

–আপনার তো অনেকগুলো ব্যবসা। একটা কোথাও ঢুকিয়ে দিন না।

রমেশ সরকারী চাকুরে হলেও সেই সূত্র ধরেই কয়েকরকম সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করেন অন্য নামে। দু'হাতে টাকার রোজগার করছেন, তাই নিয়েই মনের খুশীতে আছেন।

রমেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, নিজের আত্মীয়-টুকুম্বের মধ্যে কারুকে চাকরি দেওয়া পছন্দ করি না। সেটা ভালো দেখায় না। তার চেয়ে এখানে থাক না যতদিন ইচ্ছে।

রমেশের ঘর দোতলায়। সন্ধেবেলা তিনি একটু মদ্য পান করেন। এবং কাজটা তিনি লুকিয়ে করতেই ভালোবাসেন! নিজের স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না।

জানলার ধারে তিনি একটা গেলাস নিয়ে বসে ছিলেন। হঠাৎ মাথার ওপরে, ছাদে কি একটা শব্দ পেলেন।

স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের শব্দ হলো?

-কোথায় আবার শব্দ? আমি তো শুনি নি?

ছাদের ঘরে চেয়ারে টানার শব্দ হল না?

–তাই বলো, ও ঘরে তো অরু থাকে।

-অরিন্দম? তাকে যে দেখলাম, এইমাত্র রাস্তায় গেল।

-ফিরে এসেছে বোধ হয়।

-ফিরে এসেছে কি? এই তো গেল। চোরটোর নয় তো!

-এই সন্ধেবেলা চোর আসবে কোথায় থেকে?

রমেশ তাঁর ব্যবসার টাকা পয়সা বাড়িতে সিন্দুকেই রাখেন। অফিসে করুকে বিশ্বাস করেন না, ব্যাঙ্কে রাখারও অসুবিধে আছে। সব সময় সেই জন্যেই তার চোরের ভয়। তিনি বললেন, একবার দেখতে হচ্ছে।

-তুমি বসে আছো, বসো না। আমি দেখছি।

-না, চলো। আমি যাই।

রমেশ ঘর থেকে বেরুতেই তার স্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, ও কুন্তলা, কুন্তলা? ছাদের সিঁড়িতে আলো জ্বালা আছে?

এটা একটা ইশারার কথা! কুন্তলার ঘর সিঁড়ির পাশেই। সে বৌদির কথা শুনেই তরতর করে উঠে গেল ওপরে। কোনো সাড়া দিল না।

সব্যসাচী তখন বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করছিল। কুন্তলা ঘরে ঢুকে তাকে চেপে শুইয়া দিল খাটে। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, চুপ? একটাও শব্দ করবেন না।

তারপর মরা মানুষকে যেমন ঢাকে, সেই রকম একটা কম্বল দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে দিল তাকে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে কুন্তলা দাঁড়িয়ে রইলো। উত্তেজনায় তার মুখখানা লালচে। রমেশ এসে দরজা ধাক্কাতেই কুন্তলা বলে উঠলো, কে?

রমেশ জিজ্ঞেস করলেন, কে রে, ভেতরে? কুন্তলা নাকি?

-হ্যাঁ, দাদা। আমি।

-তুই এখানে কি করছিস?

কুন্তলা দরজা খুললো, ভেতরটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললো, এখানে বসে একটু পড়াশুনা করছি

রমেশ ভুরু কুঁচকে বললেন, অরিন্দম এখানে শোয়। আর তুই এখানে পড়াশুনা করছিস মানে? বাড়িতে আর জায়গা নেই?

–অরিন্দমদা বেরিয়ে গেলেন, তাই আমি একটু এলাম। এখানে খুব হাওয়া।

- আজ আবার গরমটা কোথায়?

কুন্তলা বেরিয়ে হেসে বললো, দাদা, তুমি রেগে গেছো মনে হচ্ছে? আমি এখানে পড়তে বসেছি তো কি হয়েছে?

রমেশ একটু থতমত খেয়ে গেলেন। তাঁর এই বোনটি বড় আদরের। সকলের মুখের ওপর টকাস টকাস করে কথা বলে। রমেশের বাবা-মা তীর্থ করতে গেছেন, কুন্তলা সঙ্গে যায় নি, পরীক্ষার পড়া পড়বে বলে।

রমেশ অবিবাহিত ছেলে মেয়েদের মেলামেলা বেশি পছন্দ করেন না। অরিন্দমের সঙ্গে কুন্তলা হাসিঠাট্টা করে– এটা খুব একটা ভালো নয়। মুখে কিছু বলতে পারেন না যদিও। কুন্তলা মেয়ে অবশ্য খুবই ভালো, তার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ করা যায় না। তবু, বলা তো যায় না, (ঘি আগুন এত কাছাকাছি থাকা)-অরন্দিমের সঙ্গে কুন্তলার বিয়ে দিয়ে কেমন হয়? তাতে যদি ছেলেটার মতিগতি ফেরে–তাহলে না হয় একটা চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আর যদি ঘরজামাই হয়ে-থাকতে চায়, আপত্তি নেই।

এই সব ভাবতে ভাবতে রমেশ নিচে নেমে এলেন।

কুন্তলা সিঁড়িতে উঁকি দিয়ে দাদার নিচে যাওয়া দেখে নিশ্চিত হয়ে আবার ঘরে ঢুকলো। কম্বলটা সরিয়ে ফেলে জিজ্ঞেস করলো, খুব কষ্ট হচ্ছিল?

সব্যসাচী প্রথমে কিছুক্ষণ কোনো কথা বললো না। তারপর নিজের চেষ্টাতেই উঠে বসলো। বললো, দ্যাখো তো, অরিন্দম কোথায় সিগারেট রেখে গেছে। অনেকদিন সিগারেট খাই নি।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে পাওয়া গেল সিগারেট আর দেশলাই। বাড়িয়ে দিল সব্যসাচীর দিকে।

সব্যসাচীর একটা হাত আশক্ত। দেশলাই জ্বালাবার ক্ষমতা নেই। সে কিছু বললো না, কুন্তলা বুঝতে পারলো। কুন্তলা ওর ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে দিয়ে দেশলাই জ্বেলে বললো, এই নিন!

সব্যসাচী সিগারেট ভালো করে টান দিয়ে বললো, শোন কুন্তলা তুমি আমাদের জন্যে এত করছো কেন?

-কি করছি?

-এই যে আমার সেবাযত্ন করছো, এর ফল জানো? পুলিশ আমাকে ধরার পর তোমাকেও ধরবে।

-ধরুক!

-জেলে যেতে চাও তুমি? ভাবছো জেলটা খুব রোমান্টিক জায়গা? অনেক পাগল হয়ে যায়। যাই হোক তোমাদের ওপর নির্ভর করে আছি বলে আমার নিজের ওপর ঘেন্না আর লজ্জা হচ্ছে।

-লোকের কি অসুখ করে না?

-আমার করে না। সাত বছর বয়সের পর আমি অর কোনো অসুখে শুয়ে থাকি নি। তাছাড়া মেয়েদের হাতের সেবা নেওয়া আমার পছন্দ হয় না।

-আমি মেয়ে না হয়ে কোনো ছেলে হলে এমন কি তফাত হতো?

-অনেক তফাত হতো। মেয়েদের সংসর্গ আমাদের এড়িয়ে থাকা উচিত। এতে আমাদের ব্রত নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

-আপনি মেয়েদের ভয় পান?

-নিজেকের ভয় পাই। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, আশা করি তুমি সব বুঝবে তাই তোমাকে খোলাখুলি বলছি। আমাদের রক্ত-মাংসের শরীর। এই শরীরে কি কামনা বাসনা নেই? সবই আছে। ব্রত পালনের জন্যে সেসব দমন করে থাকতে হয়। নির্জন ঘরে তোমার মতন সুন্দরী মেয়ে এত কাছাকাছি থাকলে আমাদের সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে।

কুন্তল ঠোঁট টিপে হেসে বললো, আমি সুন্দরী বুঝি?

-কেন, তুমি আয়না দেখো না? সুন্দরের প্রতি আমার একটা মোহ আছে। এক সময় আমি কবিতা-টবিতা লিখতাম-এখন সেসব ঘুচিয়ে দিয়েছি। তবু মাঝে মাঝে মন দুর্বল হয়ে যায়। তাছাড়া অরিন্দমের বোধ হয় তোমার সম্বন্ধে–

কুন্তলা সব্যসাচীকে থামিয়ে দিয়ে বললো, আপনি তো অনেক কথা বললেন, এবার আমি কিছু বলি? আপনি মেয়েদের সম্পর্কে কি ভাবেন জানি না। মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের বঝি শুরু কামন বাসনার সম্পর্ক? আপনারা দেশের জন্য চিন্তা করতে পারেন, কোনো মেয়ে বুঝি তা পারে না?

-তেমন তো দেখি না বিশেষ। আমাদেরই দলের অনেক ছেলে মেয়েদের জন্য নষ্ট হয়ে গেল। শুধু বিয়ে করার জন্যে পুলিশের ইন-ফর্মারও হয়েছে কেউ কেউ।

কুন্তলা বললো, আমার কথাটা এখনো শেষ হয়নি। আমি দেখছি, ছেলেদের মধ্যেও অনেকে দেশের কথা ভাবে না। খায়-দায়, ফুর্তি করে কিংবা শুধু নিজের জীবনের কথা ভাবে। সেই জন্যই যখন শুনি কেউ কেউ নিজের ঘর সুখসম্ভোগ ছেড়ে দেশের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়েছে– তখন তাদের ওপর আমার খুব শ্রদ্ধা হয়। তাদের যদি কখনো সামান্য সাহায্য করতে পারি, তাহলে নিজেদের ধন্য মনে করবো। সে রকম কারুকে তো আগে কাছ থেকে দেখিনি, আপনাদেরই প্রথম দেখলাম। কিন্তু আপনারও যদি সাধারণ প্রেম ভালোবাসার কথা বলেন কিংবা ন্যাকামি করতে আসেন, তাহলে আমি খুব দুঃখ পাবো। শুধু দুঃখ পাবো না, দরকার হলে আপনাদের মুখে থুতু ছিটিয়ে দেবো।

সব্যসাচী ম্লান গলায় বললো, তাহলে তুমি আমার মুখে থুতু দাও। আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। শুধু যে আমার শরীরটাই এখন দুর্বল তা-ই নয়, আমার মনটাও দুর্বল এখন। তুমি যখন আমার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও কিংবা আমার গায়ে তোমার হাতের ছোঁয়া লাগে আমি ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠি!

ছি!

কুন্তলা এত কঠোর হয়ো না। কঠোর হওয়া মেয়েদের মানায় না। আমি তো এই কথাটা স্বীকার না করলেও পারতাম। কিন্তু নিজের দুর্বলতা আমি গোপন রাখতে চাই না। তুমি কেন আমাকে এভাবে নষ্ট করে দিচ্ছো?

-প্লিজ এরকম করে বলবেন না। মেয়ে হওয়া কি আমার অপরাধ?

-অপরাধ কি না, ঠিক তা জানি না। তুমি আর এ ঘরে এদম এসো না। আমার বাণ্ডেজ-ফ্যাণ্ডেজ যা বদলবার তা অরিন্দমই করে দেবে। এভাবে বেশী দিন থাকারও কোনো মানে হয় না।

-আপনার ইয়েটার জন্য একজন ডাক্তার বিশেষ দরকার।

-মনে হচ্ছে, আমার হাতটা পচে যাচ্ছে। বোধ হয় হাতটা কেটে বাদ দিতে হবে।

কুন্তলা মুখ দিয়ে একটা ভয়ের শব্দ করলো।

সব্যসাচী বললো, মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে। আজ হোক কাল হোক, আমাকে মরতেই হবে। রাসবিহারী বোস ছাড়াও এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোনো বিপ্লবই বৃটিশ

পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পায় নি। দেশের কাজ বলতে তোমার মনে নিশ্চয়ই একটা আবছা ধারণা আছে। আমরা কি করেছি, তা কি তুমি জানো? আমরা একটা রেল-ডাকাতি করতে গিয়েছিলাম-সেখানে একজন বা দু'জন লোককে আমরা মেরে ফেলেছি। ফাঁসির দড়ি আমার মাথার ওপর ঝুলছে।

কুন্তলা এগিয়ে এসে ব্যাকুলভাবে বললো, মৃত্যুর কথা বলবেন না। আপনাকে বাঁচতে হবে।

- সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে হয়তো বাঁচা যায়। কিন্তু আমার ধর্মবিশ্বাস নেই। বিবেককে ফাঁকি দিয়ে আমি বাঁচতে চাই না। তবে, মরার আগে একটা প্রচন্ড লড়াই দিয়ে যেতে চাই। তাও যদি না পারি, তাহলে আমার দুঃখের শেষ থাকবে না।

- সেই জন্যও তো আপনার সেরে ওঠার দরকার। আমি কি এইটুকু সাহায্য করতেও পারি না?

সব্যসাচী বললো, তোমার হাতটা আমার কপালে একবার রাখো।

কুন্তলা বিনা দ্বিধায় তার ডান হাতটা ছোঁয়ালো সব্যসাচীর কপালে। সব্যসাচী তার ওপর নিজের সুস্থ হাতটা রাখলো। বললো, আঃ কি নরম আর ঠাণ্ডা তোমার হাতা। কপালটা জুড়িয়ে যায়। এই রকম সময় মনে হয় কি জানো, কি হবে যুদ্ধ বিগ্রহ করে। বাইরে ছোটাছুটি করাই বা কি দরকার। এই রকম একটা জায়গায় সারাজীবন শুয়ে থাকি, তোমার হাতটা আমাকে ছুঁয়ে থাকুক।

মাথাটা সরিয়ে সব্যসাচী হঠাৎ আবার রুক্ষভাবে বললো, এই জন্যই বলছিলাম, তোমার আর এ ঘরে আসবার দরকার নেই। কক্ষনো আর আমার সমানে আসবে না।

কুন্তলাও দীপ্তভাবে জবাব দিল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবো। যতদিন না আপনি সেরে ওঠেন, আমি আপনার সেবা করবো। তারপর আপনি সুস্থ হয়ে উঠলে, জোর করে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো যুদ্ধে। তখন আর আমার দেখা পাবেন না।

রমেশ নিচে নিজের ঘরে ফিরে মদের পাত্রটি নিয়ে বসে নানা কথা ভাবছিলেন। ভাবতে ভাবতে তার চৈতন্য উদয় হলো।তিনি এবার স্ত্রীকে কিছু না বলে সোজা উঠে এলেন ওপরে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

কুন্তলা মেঝেতে বসে ছিল সব্যসাচীর খাটের পাশে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়লো। সব্যসাচী তার বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে চেপে ধরলো রিভলভারটা।

রমেশ জিজ্ঞেস করলেন, এ কে?

কুন্তলা সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললো, দাদা, তুমি তো কখনো সন্ধেবেলায় ওপরে আসো না?

- এ কে? জবাব দিচ্ছিস না কেন?

সব্যসাচী শান্তভাবে বললো, আপনি বসুন। আমিই সব বলছি।

॥ ছয় ॥

অরিন্দম ফিরে এসেছে। তার দিদিও উঠে এসেছেন ওপরে। রমেশ নিজের স্ত্রীকে আর শ্যালককে অভিযুক্ত করে বললেন, তোমরা আমাকে পথে বসাতে চাও?

অরিন্দম বললো, দিদির কোনো দোষ নাই। সব দায়িত্ব আমার। আমরাই জোর করে এখানে উঠেছি-আপনি তখন ছিলেন না। আমার আর কোন উপায় ছিল না।

- কিন্তু এসবের মধ্যে আমাকে জড়ানোর মানে কি?

–আমরা কয়েকদিন পরেই চলে যাবো।

- কয়েকদিন? তোমরা আজই চলে যাও।

- আজ যাওয়া অসম্ভব। আমি একটু ঘুরে দেখে আসতে গিয়েছিলাম। এখানকার রাস্তায় পুলিশ গিজগিজ করছে। কিন্তু একটা ব্যাপার সন্দেহ করে বাইরের পুলিশ এখানে এসেছে।

তোমার বন্ধু তো অসুস্থ। ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসো গে!

তার উপায় নেই। পুলিশ ওকে চিনে ফেলবে। পুলিশের কাছে ওর ছবি আছে।

- সর্বনাশ। তাহলে পুলিশ তো এ বাড়িতে আসতে পারে।

- জামাইবাবু আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন। আমরা যদি আর বাড়ি থেকে না বেরোই -আমাদের কেউ খোঁজ পাবে না। আজকের কাগজে আসানসোলের একটা ঘটনা দেখলাম। আমাদের দলের কেউ কিনা ঠিক বুঝতে পারছি। যাই হোক পুলিশ এখানো ওদিকেই জোরদার করবে তল্লাশি।

সব্যসাচী বললো, আমার জামাটা গায়ে গলিয়ে দে। আমি চলে যাচ্ছি।

অরিন্দম তাকে চোখের ইশরায় চুপ করতে বললো।

সব্যসাচী তবু বললো, কারুক ওপর জোর করে জুলুম করে আমি আর থাকতে চাই না। আমি আমার রাস্তা খুঁজে নেবো।

অরিন্দম দিদির দিকে তাকালো। দিদি তাঁরা স্বামীকে বললেন , হ্যাঁ গো, তুমি এই অসুস্থ ছেলেটিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে?

রমেশ বললেন, যারা এই সব কাজের ঝুকি নেয়,তাদের কি উচিত আমাদের মত নিরীহ লোককে বিপদে জড়ানো?

সব্যসাচী বললো, আমরা যে কাজ করছি, সেটা আমার আপনার এবং সকলের জন্য। স্বাধীনতা এলে আপনিও তার ফল ভোগ করবেন, কিন্তু তার জন্য একটুও স্বার্থত্যাগ করতে পারবেন না।

- অত সব বড় বড় কথা আমি বুঝি না। ইংরেজ রাজত্বে আমরা কি খারাপটা আছি? তবু দেশে একটা নিয়মকানুন আছে। ইংরেজ চলে গেলে কে চালাবে দেশটা? আপনারা আপনাদের তো বারো রাজপুতের তেরো হাড়ির হাল। নিজেদের মধ্যে এখন থেকেই মারামারি খাওয়া-খাওয়ি করছেন।

সব্যসাচী কিছু একটা কঠিন কথা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু দিদির কথা চিন্তা করে চুপ করে গেল। মুখ নীচু করে শুধু আস্তে আস্তে জানালো, আপনাকে বিপদে ফেলার জন্য মাফ চাইছি। এখন যদি আমরা চলে যাই, তাহলে আমাদের কথা কেউ জানতে পারবে না। যদি ধরা পড়ি, আমাদের মেরে ফেললেও কোনো কথা বলবো না। দিদি, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।

সব্যসাচী উঠে দাঁড়িয়েছে। অরিন্দম কি করবে বুঝতে পারছে না। সব্যসাচী তাকে খানিকটা ধমক দিয়ে বললো, দেরি করছিস কেন?

- সত্যি যাবি?

- তা ছাড়া কি, এমনি এমনি বলছি নাকি?

কুন্তলা পাথরের মূর্তির চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দিদির মুখ মাটির দিকে। তিনি নরম স্বভাবে মহিলা, স্বামীর ওপরেও জোর দিয়ে কথা বলতে পারে না।

রমেশের সামনেই সব্যসাচী পিস্তলটা গুজলো কোমরে। টাকাগুলোএকটা খবরের কাগজ দিয়ে বন্ডিল করা সেটা ও গুজ পেটের সঙ্গে। জামাটা তুলে নিয়ে একটা হাত গটো গুজে নিল একটা হাত ঝুলতে লাগলো বাইরে। তার গায়ে তখনও অনেক জ্বর। চোখ দুটো লাল। তবু গলায় জোর আছে। অরিন্দমের কাধে! অরিন্দমের কাঘে হাত রেখে বললো চল।

সব্যসাচীকে দেখলেই বোঝা যায়, এরকমভাবে বেশীক্ষণ চলতে পারবে না। অত বড় চেহারার মানুষটা একেবারে অসহায় হয়ে গেছে। বারে বারে অরিন্দমের গায়ের ওপর ঝুকে পড়ছে। নেমে গেল সিড়ি দিয়ে।

বাইরে রাস্তায় লোক চলাচল কম। রীতিমত অন্ধকার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সব্যসাচী বললো, স্টেশন কত দূরে?

অরিন্দম বললো, মাইল দেড়েক দূরে।

ঠিক আছে, যদি একটা সাইকেল রিকসা টিকশা পাওয়া যায় তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। আমাকে স্টেশনে পৌছে দিয়ে তুই ফিরে আসবি। তোর তো এখানে থাকার কোনো অসুবিধে নেই!

রমেশ সঙ্গে সঙ্গে দরজার পর্যন্ত এসেছিলেন! তিনি বললেন, একটু দাঁড়িয়ে যান তাহলে। এখান থাকে রিক্সা ধরে –

না এগিয়ে যাই ততক্ষণ। এরপর কটার সময় ট্রেন আছে।

কোন দিকের?

- যে কোনো দিকের।

-আটটা কুড়িতে একটা------

-ঠিক আছে। ধন্যবাদ-

পেছন থেকে চটি ফটফটের আওয়াজ পাওয়া গেল। কুন্তলা বেরিয়ে এসে বললো, চলুন আমিও যাচ্ছি।

রমেশ বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কোথায় যাবি, কুন্তলা?

কুন্তলা বললো, ওদের ষ্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি। নতুন লোক, রাস্তাঘাট চিনতে পারবেন না-

অরিন্দম মৃদু গলায় জানালো, না কুন্তলা, তোমার যাবার দরকার নেই–

-চলুন দেরি হয়ে যাচ্ছে শুধু।

রমেশ এসে কুন্তলার হাত চেপে ধরে বললেন, কি পাগলামি করছিস! আয়, বাড়িতে আয়-

কুন্তলা অত্যন্ত শান্ত এবং দৃঢ় গলায় বললো, দাদা আমি যাবো!

- তুই বাড়িসুদ্ধ সবাইকে বিপদে ফেলতে চাস?

-আমি আর কারুকে বিপদে ফেলবো না।

রমেশ অসহায় বোধ করলেন। ছোট মফঃস্বল শহর। এখানকার রাস্তা দিয়ে ছেলে- মেয়েরা এখনো পাশাপাশি হাঁটে না। বিশেষত সন্ধ্যের পর কোনো কুমারী মেয়েকে পথে দেখতে পাবার কথা ভাবাই যায় না। আর কুন্তলা এখন যাবে, কোমরে পিস্তল গোঁজা ছোকরাদের সঙ্গে। যে কোনো মুহূর্তে যাদের পুলিশে ধরতে পারে?

তিনি এ কথাও জানেন, কুন্তলাকে জোর করে ফেরাতে গেলে এখন অনেক কাণ্ড হবে। যা জেদী মেয়ে, কিছুতেই কথা শুনবে না। চেঁচামেচি শুনে অন্য লোকজন না এসে পড়ে।

তিনি পেছন ফিরে তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। দিদির মুখ ভাবলেশহীন। বোঝা যায়, কুন্তলাকে ফেরাবার জন্য দিদি একটি কথাও বলবেন না। দূরে হেড লাইট জ্বালিয়ে একটি গাড়ি আসছে। রমেশ ভয় পেয়ে গিয়ে বললো, ভেতরে চলে এসো, সবাই ভেতরে চলে এসো-

সব্যসাচী বা অরিন্দম সে কথায় ভ্রুক্ষেপ করলো না। তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে রইলো গাড়িটার দিকে। রমেশ ওদের কাছে এসে হাত জোড় করে বললেন, আপনারা ভেতরে চলে আসুন-- যদি পুলিশের গাড়ি হয়--- এইখানেই যদি ধরে ফেলে --- হা ভগবান!

গাড়িটা পুলিশেরই। সব্যসাচী আর অরিন্দম দ্বিধা না করে ফিরে এলো বাড়ি মধ্যে। দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হলো। রমেশ জানালার খড়খড়ি দিয়ে দেখতে লাগলেন বাইরে।

পুলিশের গাড়িটা থামলো না, বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল।

রমেশ জানালার কাছ থেকে সরে এসে বললেন, আপনাদের কারুকেই যেতে হবে না। আপনারা থাকুন।

সব্যসাচী বললো না, দরকার নেই। এবার আমরা যেতে পারবো। পুলিশের গাড়ি ঘন ঘন আসে না।

রমেশ হাত জোড় করে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, আমার ঘাট হয়েছে। আমি ক্ষমা চাইছি! আপনারা চলে গেলে আমার বউ আর আমার বোন আমাকে বাড়িতে টিকতে দেবে না। নিরীহ লোক তাই ভয় পেয়ে অমন কথা বলছিলাম!

হঠাৎ স্ত্রী ও বোনের দিকে ফিরে রমেশ গলা চড়িয়ে বললেন, ভদ্রলোকের এমন অসুখ, আর তোমরা একটা ডাক্তার ডাকতে পারো নি? আমি বাড়িতে ছিলাম না বলে কি এটুকুও তোমার করতে পারো না?

সবাই চুপ করে রইলো। রমেশ নিজেই অবিলম্বে ডাক্তার ডাকতে চলে গেলেন। এল. এম. এফ পাশ অতি সাধারণ ডাক্তার-রমেশের অনেক কালের বন্ধু-এ বাড়িতে প্রায়ই আসেন।

তিনি অপরিচিত যুবক দুটিকে দেখে কোনো রকম কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। ব্যান্ডেজ খুলে সব্যসাচীর বীভৎস ক্ষতটা পরীক্ষা করে মন্তব্য করলেন-এটা তো চার পাঁচ দিনের পুরোনো এর মধ্যে কিছুই চিকিৎসা করান নি?

সবাই চুপ।

ডাক্তার আবার বললেন, কেউ যদি নিজেই নিজের জীবনটা নষ্ট করতে চায়, তাহলে ডাক্তার কি করবে? ভেতরে এক খন্ড কাচ ঢুকে আছে। এই নিয়ে কেউ চুপচাপ থাকতে পারে?

হঠাৎ তিনি সব্যসাচীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি করেন?

সে একটু ইতস্তত করে উত্তর দিল, একটা ইস্কুলে পড়াই।

ডাক্তার উচ্চকণ্ঠে কাষ্টহাসি হাসলেন। তারপর বললেন,আপনি পরশুরাম আর কর্ণের গল্প জানেন না? কর্ণ নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে পরশুরামের কাছে গিয়েছিল অস্ত্রবিদ্যা শিখতে। তারপর একদিন পরশুরাম কর্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছি- এমন সময় একটা বজ্রকীট কর্ণের উরু কামড়ে ধরে মাংস খুলে নিল।

গুরুর ঘুম ভেঙ্গে যাবে এই ভয়ে কর্ণ পা সরিয়েও নিল না, মুখ দিয়ে একটা শব্দও করল না। ঘুম ভেঙ্গে উঠে পরশুরাম এই কান্ড দেখে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তুমি তো ব্রাহ্মণ নও, তুমি ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ কখনো এত কষ্ট সহ্য করতে পারে না। সেই রকমই বলছি, কোনো সাধারন স্কুল মাস্টার শরীরে একখানি যন্ত্রণা নিয়ে চুপ করে থাকে না। আপনারা কে, তো বুঝতে আমার বাকী নেই। কিন্তু এখন আমার একটা বিপদের কথা শুনুন। এখন যদি আমি বলি, এর চিকিৎসা করবার সাধ্য আমার নেই- তা হলে আপনারা ভাববেন, আমি ভয় পাচ্ছি। কিন্তু সত্যিই হাসপাতালে নিয়ে অপারেশন না করলে কিছুই হবে না।

-হাসপাতালে যাওয়া এখন সম্ভব নয়।

-তা হলে আমি কি করবো বলুন?

-কাঁচটা আপনি বার করে দিতে পারবেন না?

-আমার কাছে কি যন্ত্রপাতি আছে না, অজ্ঞান করার ব্যবস্থা আছে? কিছুই নেই, তবে গ্রামের নাপিতরা যেমন খোঁচাখোঁচি করে অনেক অপারেশন করে, সেই চেষ্টা করতে পারি।

তাতে সব্যসাচী বললো, সে যা হয় হোক। আপনি এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে আমার জ্বরটা কমে যায়-দু'তিন দিনের মধ্যে বাইরে বেরতে পারি।

সব্যসাচীকে কড়া ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে রাখা।

তিনতলা সেই ঘরের খাটের ওপর তাকে শোয়ানো হয়েছে আবার। অরিন্দম শুয়েছে মাটিতে বিছানা পেতে।

অরিন্দমের ঘুম আসছে না। শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে। ভবিষ্যতে কোনো পরিকল্পনা ঠিক করতে পারছে না। তারা আগে থেকে সব কিছু ছকে রেখেছিল। ট্রেন আক্রমণের সময় দলের কেউ যদি মারা যায় কিংবা ধরা পড়ে-তবুও অন্য কেউ তার জন্য অপেক্ষা করবে না। দয়ামায়া প্রশ্ন এখন বাস্তব। কার্য-উদ্ধারের জন্য ঘনিষ্টতম বন্ধুকেও বিসর্জন দিতে হবে দরকার হলে।

কিন্তু সব কিছু তো হিসেবের মধ্যে থাকে না। হঠাৎ যদি একজন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং আরেক জনের আত্মীয় বাড়িতে তাকে আশ্রয় দিতে হয়-তখন কি করা উচিত। এখন অরিন্দম সব্যসাচীকে একা ফেলে কিছুতেই চলে যেতে পারে না। তাছাড়া সব্যসাচী তাদের দলের একজন প্রধান নেতা, শুধু বন্ধু তো না, এই সময় তারই তো নির্দেশ দেবার কথা।

কাগজে কাগজে এই ট্রেন লুঠের ঘটনা নিয়ে রোজ লেখালেখি চলছে। একজন কেউও এ পর্যন্ত ধরা পড়েনি। তারা এ ব্যাপারে দারুণ স্বার্থক হয়েছে। কিন্তু এর পরের ব্যাপারে কি হবে? আর কয়েকদিন পরই সেই নির্দিষ্ট গোপন জায়গায় সবার দেখা কথার কথা। সে আর সব্যসাচী যদি না যেতে পারে-রতনলাল কি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এখনো কত কাজ বাকি আছে।

বিছানায় ছটফট করে অরিন্দম। এক সময় বাইরে কারোর পায়ের আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠলো। উঠে এসে দেখলো, ছাদে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার দিদি।

অরিন্দম জিজ্ঞেস করলো, মেজদি, তুমি ঘুমোও নি?

দিদি বললেন, তুইও তো ঘুমোস নি? তুই বুঝি জেগে জেগে পাহারা দিচ্ছিস?

-না! পাহারা দেবার কিছুই নেই। ও তো একবারে অজ্ঞান। এমনিই আমার ঘুম আসছে না। জামাইবাবু খুব রাগ করছেন না?

-ও এমনিই। মানুষটা দুর্বল। কি যে করবে, নিজেই বুঝতে পারে না।

--তোমাদের তো বিপদে ফেলা হলো ঠিকই। আমি ভেবেছিলাম, এক রাত্তির থেকেই চলে যাবে।

নিয়তিতে যদি থাকে, তাহলে কি বিপদ ঠেকানো যাবে? কিন্তু তোরা এসব কি করছিস? তোরা বুঝি ডাকাতি করিস?

-কে বললে তোমাকে?

-খবরের কাগজে সব দেখেই বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ রে, পাপের পথে গিয়ে কি কখনো ভালো কাজ হতে পারে?

-কোনটা পাপ? বিদেশী সরকার আমাদের দেশ থেকে টাকা শুষে নিচ্ছে- সেই টাকাই যদি আমরা জোর করে কেড়ে নিই, সেটা কি পাপ?

-অরু, তোদের কথা ভাবলেই আমার বুক কাঁপে। একি সর্বনাশা পথ! এর থেকে বিলীত জিনিস বয়কট করা ভালো নয়?

-দিদি, ওসব ব্যাপারে আজকাল আর কেউ ভোলে না। কয়েকজন বিপ্লবীকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতেই হবে। নইলে দেশের লোক মনে জোর পাবে না।

-কয়েকজনকে জেল থেকে ছাড়াবার জন্য আর কয়েকজন প্রাণ দেবে? এ আবার কেমনধারা কথা! এই যে ছেলেটা মরতে বসেছে- এ কার জন্য?

-সব্যসাচী! ও মরবে কেন? একটা হাত নষ্ট হয়ে গেলেও বাকি একটা হাত দিয়েই যা ও করতে পারে- একশো জন তা পারে।

-তোরা এই পথ ছেড়ে দে। এমনি দেশের লোককে বোঝা, লেখাপড়া শেখা- তারপর সবাই মিলে এক সঙ্গে ক্ষেপে উঠলেই কাজ হবে। বাবা তো এই কথাই বলতেন।

-মহাত্মাজী তো দেশের লোককে কতদিন ধরে বোঝাতে চেষ্টা করছেন। কি লাভ হলো তাতে।

-বাবা কেমন আছেন রে?

-এমনিতে ভালোই। হাঁপানিটার জন্য বাইরের কাজ বিশেষ কিছু করতে পারে না বলে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন।

-বাবা তো এক সময় অনেক কিছু করেছেন।

-এ একটা নেশা। একবার ধরলে ছাড়া পায় না।

অরু, তুই কথা দে, সব সময় সাবধানে থাকবি, তুই মায়ের সবচেয়ে ছোটো ছেলে।

-সব্যসাচী ওর মায়ের একমাত্র ছেলে।

- ও তো আমার কথা শুনবে না। তুই কথা দে-আর যাই হোক, জীবনের ঝুঁকি কখনো নিবি না।

-আচ্ছা! তুমি এবার শুতে যাও!

বেলা এগারোটা। সব্যসাচী তখনও ঘুমিয়ে। অসুস্থতার জন্য মুখখানা একটু বিবর্ণ। ঠোঁটে খানিকটা বিষন্ন রেখা। কপালের ওপর চুল এসে পড়েছে।

অরিন্দম নিচে গেছে স্নান সেরে নিতে। কুন্তলা এককাপ দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকলো। এর আগে কয়েক বার ডেকে ডেকে সব্যসাচীকে খাওয়ানো যায় নি কিছু।

মাথার কাছটায় একটু ঝাঁকনি দিতেও সব্যসাচীর ঘুম ভাঙলো না। কুন্তলা খুব অস্বস্তিতে পড়লো। ছোটো ছেলে তো নয় যে ঘুমের মধ্যেই ঠোঁট ফাঁক করে মুখে দুধ ঢেলে দেবে। অথচ কাল সন্ধ্যে থেকেই সব্যসাচী কিছু খায়নি। না খেলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।

কুন্তলা সব্যসাচীর গায়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগলো, এই, এই।

ঘুমের ঘোরেই সব্যসাচী এক হাত ছুঁড়ে বিরক্তভাবে বললো, আঃ!

কুন্তলা তখন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললো, পুলিশ-

সঙ্গে সঙ্গে সব্যসাচী চোখ খুললো। এই শব্দটার সঙ্গে যেন তার স্নায়ুর যোগ আছে। সঙ্গে সঙ্গে শরীর সর্তক হয়ে উঠে।

দু'চোখ বিস্ফরিত করে সে বললো কি?

কুন্তলা হেসে বললো, কিছু না।

তারপর বললো, দুধটা খেয়ে নিন।

সব্যসাচী আপত্তি করলো না। ঢক ঢক করে দুধটা শেষ করে মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলো আঃ!

সেই শব্দটা যন্ত্রণার না আরামের তা ঠিক বোঝায় যায় না।

এখন একটু ভালো লাগছে?

-খুব। হঠাৎ কি কথা মনে পড়লো জানো? রেলের ইঞ্জিন ড্রাইভারটা যেভাবে আমাকে বোতলটা দিয়ে মারতে গিয়েছিল, যদি সেটা ঠিক মতন লাগতো কিংবা চোখে মুখে লাগতো-তা হলে হয়তো আমি অনেক আগেই মরে যেতাম। তা যে মরিনি, এখনো যে বেঁচে আছি, সেটাই খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার।

-মুখ চোখ ধোবেন? জল নিয়ে আসবো?

-তুমি ধুইয়ে দেবে?

কুন্তলা হাসলো। বললো, কাল যে বলেছিলেন, আমার হাতের সেবা নেবেন না? আমি মেয়ে, সুতরাং আমি অপবিত্র।

-সে কথা মোটেই বলিনি। অরিন্দম কোথায়?

-নিচে গেছেন।

-অরিন্দম আসুক। ততক্ষণ তুমি একটু বসো।

কুন্তলা টেবিলের পাশটায় চেয়ারের বসতে যাচ্ছিল, সব্যসাচী বললো, এখানে এসো এই বিছনানায় বসো! আমার তো ছোঁয়াচে অসুখ নয়!

কুন্তলা এসে বসলো খাটের ধার ঘেঁষে। মুখে হাসি মাখানো থাকলেও ভঙ্গিটা একটু আড়ষ্ট।

সব্যসাচী বললো, একটা হাত নষ্ট হলেও আমি বেঁচে উঠবো ঠিকই, কি বলো?

কুন্তলা বললো, হাতটাই বা নষ্ট হবে কেন? দুটো কাচের টুকরো কাল বেরিয়েছে। আর কিছু নেই।

আমার এই কাঁধের কাছটা পেকে থসথসে হয়ে গেছে। ভাবলেও ঘেন্না করে।

-এবার সব সেরে যাবে।

-আমি যেন একটা বাচ্চা ছেলে, তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ। শুনতে ভালোই লাগে অবশ্য। তুমি গ্রাংগ্রিন কথাটা শুনেছো! হয়ে যেতে পারে-তাতে কেউ বাঁচে না, সাধারণত। সে রকমভাবে মানুষকে আমি মরতেও দেখেছি। অবশ্য আমি যে সে রকমভাবে মরবো, তেমন কথা নেই। আমি বাঁচতে চাই!

কুন্তলা চুপ করে রইলো। সব্যসাচী তার সুস্থ হাতটা কুন্তলার বাহুতে রাখলো।

তারপর বললো, কি সুন্দর এই পৃথিবী-আর আমি এখানে থাকবো না, তা কি হতে পারে?

কুন্তলা এতেও কোনো কথা বললো না। সব্যসাচী জিজ্ঞেস করলো, আমি যে তোমার গায়ে হাত ছোঁয়ালাম তাতে তুমি সরে বসলে না?

- কেন?

মেয়েরা তাই তো করে! পর পুরুষদের হাত, এক্ষুণি কেউ এসে দেখে ফেলতে পারে।

-আপনি এসব কথা বলেছেন কেন?

-কি জানি! আমার বোধ হয় মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! গ্যাংগ্রিন হলে কি মাথা খারাপ হয়ে যায়?

-আজ আপনাকে অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে।

-তুমি আসবার ঠিক আগেই একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। তুমি এসে ডাকাডাকি করে সেই স্বপ্নটা ভেঙে দিলে।

-কি স্বপ্ন?

-স্বপ্নের কথা অন্য কারুকে বলতে নেই।

-আপনার স্বপ্নটা ভেঙে দেবার জন্য আমি দুঃখিত।

-কিন্তু আমি দুঃখিত নই। তুমি এই যে আমার পাশে বসে আছো, এটাও যেন মনে হচ্ছে স্বপ্ন। কয়েকদিন আগেও তোমাকে চিনতাম না, অথচ তোমাকে এমন কাছের আর আপন মনে হচ্ছে.....।

-আমি আপনার মুখ ধোবার জল নিয়ে আসি?

-আরও একটু বসো! তোমাকে আর একটা কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে। তুমি জানো স্বদেশীরা বীরের মতন প্রান দেয়। আমি লোভী আর কাপুরুষের মত এখন বাঁচতে চাই। তা যতক্ষণ মৃত্যু কাছাকাছি আসেনি, ততক্ষণ খুব সাহস দেখাতাম। এখন যে- কোন মূল্য দিয়ে বেঁচে থাকতে চাইছি। ইচ্ছে করছে, তোমার আঁচলের তলায় মুখ লুকোই। তোমাকে আদর করি।

কুন্তলার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। মুখ অরুনবর্ণ। তবু সে উঠে যেতে পারছে না।

সব্যসাচী বললো, তুমি আমার মুখে থুতু দিলে না? কাল যে বলেছিলে, এসব কথা বললে তুমি থুতু দেবে?

-আপনি অন্য কথা বলুন।

-না, আমি এসবই বলবো। আমার যা বলতে ইচ্ছে, করছে তা বলবো। আমার ইচ্ছে করছে, তোমার বুকে মুখ ঘষি। তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুই। কুন্তলা, আমি যদি বলি, তুমি এক্ষণি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো। আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে শোব। তুমি রাজী হবে?

সব্যসাচীকে অবাক করে দিয়ে কুন্তলা উত্তর দিল, হ্যাঁ, রাজী হবো।

-কেন?

এমনিই। এতে কি আসে যায়।

-তাহলে যাও। বন্ধ করো দরজা। যে যা ভাবে ভাবুক!

কুন্তলা সত্যি সত্যি দাঁড়ালো। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে এদিকে দাঁড়ালো একটুক্ষণ। তাকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা ছবির মতন। সব্যসাচী ভেবেছিল এই সুযোগে কুন্তলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। গেল ন। দরজার ওপরে তার হাত। সব্যসাচী তৃষ্ণার্তভাবে চেয়ে রইলো তার দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আচ্ছা, এখন নয়। এখন অরিন্দম আসবে।

একটু থেমে জিজ্ঞেস করলো, তুমি অরিন্দমকে ভালোবাসো?

কুন্তলা মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে বললো, না। ভালোবাসার কথা আজ সকালের আগে পর্যন্ত কখনো ভাবিইনি।

-আজ সকালে প্রথম ভাবলে? না,না এটা ভালোবাসা নয়। এর নাম দয়া। ঠিক আছে । তুমি আমাকে দয়াই করো। কারুর কাছে কখনো দয়া চাইনি। তোমার কাছে চাই। তুমি আমাকে একটু শান্তি দাও!

-আমি কি করে আপনাকে শান্তি দিতে পারি বলুন? আমার কি সে ক্ষমতা আছে?

-হ্যাঁ আছে। মেয়েরা জানে না তাদের কতখানি ক্ষমতা। তোমার চোখের দৃষ্টি একটুখানি ছোঁওয়া এতেই যেন আমার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। আমি তোমার বুকে আমার মুখটা ঘষতে চাই। ভীষণ ভাবে চাই।

-আপনি আজ বেশী দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

-শরীর দুর্বল থাকলেই মন দুর্বল হয়।

অরিন্দম চুল মুছতে মুছতে ফিরে এলো এ ঘরে। কুন্তলার আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে সে একটু অবাক হলো। তারপর সেটাকে মন থেকে মুছে ফেলে সব্যসাচীকে বললো, তুই উঠেছিস? শোন, তোর সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে। কুন্তলা, তুমি একটু বাইরে যাবে?

সব্যসাচী বললো, ও থাক। ওর কাছে আমাদের গোপন করার আর কিছুই নেই। কুন্তলা নিজেই বললো, আমি আপনার জন্য মুখ ধোবার জল নিয়ে আসছি।

কুন্তলা বেরিয়ে যাবার পর অরিন্দম বললো, আমি অনেক ভেবে ঠিক করলাম; রতনলালকে একটা খবর পাঠানো বিশেষ দরকার। এভাবে পড়ে থেকে আমরা দলের কোনো কাজেই লাগছি না।

-কি করে খবর পাঠাবি?

-আর তো কোনো উপায় দেখছি না। আমাকেই যেতে হবে।

-তুই একা যাবি?

-হ্যাঁ। এখন তোর এখানে থাকার কোনো অসুবিধে নেই। তুই দু'চার দিনে আর একটু সুস্থ হয়ে নে। আমাদের দুজনেরই এখানে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না।

-কিসে যাবি? সাইকেলে?

-পাগলা নাকি? সাইকেলটা আমার কাছেও রাখি নি। পরশুদিন আমি ওটাকে বাজারের কাছে ফেলে রেখে এসেছিলাম, কাল গিয়ে দেখে এসেছি, কেউ ওটা চুরি করে নিয়ে গেছে। ওটার সম্বন্ধে আর আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। আমি ট্রেনেই যাবে।

-ঠিক আছে। তুই টাকাগুলো নিয়ে যা।

-টাকাগুলো? আমি নিয়ে গিয়ে কি করবো?

-রতনলালকে লুকিয়ে দিবি। আমার কাছে তো টাকাগুলো থেকে কোনো লাভ নেই।

অরিন্দমের মনে একটু সূক্ষ্ম অভিমান ছিল যে, সব্যসাচী আহত থাকা সত্ত্বেও রতনলাল টাকাগুলো তার কাছেই দিয়েছিল, অরিন্দমকে দেয়নি। তবে, অভিমানটা এতই সূক্ষ্ম যে মনের উপরতলে আসে না। টাকাগুলো ঐ তিনজনের মধ্যে ভাগ করার কথাই আগে ঠিক ছিল, তাই আর বদলানো হয় নি।

অরন্দিম বললো, টাকাগুলো তোর কাছেই থাকা ভালো। কারণ আমি রাস্তাঘাটের অবস্থা জানি না। রতনলালের দেখা পাবো কিনা ঠিক নেই। আমি একবার ঘুরে দেখে আসি।

অরিন্দম যখন প্রস্তুত হয়ে বেরুবে তখন সব্যসাচী তাকে ডেকে বললো, অরিন্দম, শোন, কাছে আয় একটু।

অরিন্দম, কাছে আসতেই সব্যসাচী তার হাত ধরে বললো, সাবধানে থাকবি। পিস্তলটা তোর লাগবে।

-না।

-তুই ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ঘুমোতে পারবো না।

-আমার জন্য চিন্তা করিস না।

-আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি রে। ভয় হচ্ছে, তোর সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবে না।

-যাঃ, এসব কি বলছিস?

-অরু, আমার হাত ছুঁয়ে বল আবার দেখা হবে?

-আমি কাল, বড়জোর পরশুর মধ্যেই ফিরে আসবো।

অরিন্দম রাস্তায় বেরিয়ে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেল না। ধীরে সুস্থে কিছুটা পথ হেঁটে একটা সাইকেল রিক্শা নিয়ে স্টেশনে পৌছালো। বাইরের দোকান থেকে একটা পান খেয়ে সিগারেট ধরালো। তারপর টিকিট কিনে ঢুকে পড়লো স্টেশনে।

স্টেশনে ঢুকেই সে চমকে গেল। সেখানে গিজাগিজ করছে পুলিশ। হঠাৎ এক সঙ্গে অত পুলিশ দেখে মাথা ঘুরে গেল অরিন্দমের। সে আর যুক্তি ঠিক রাখতে পারলো না। মানুষও তো আসলে যুক্তহীন প্রাণীই।

পুলিশ কোনো গন্ধ পেয়েই সেখান এসেছে ঠিক। তা বলে অরিন্দমকে যে কোনো সন্দেহ করেছে, তার কোনো মানে নেই। অরিন্দমের মতন আরও অনেক লোক রয়েছে স্টেশনে। এমন হতে পারে, সেই ট্রেনে কোনো বড় দরের রাজপুরুষ যাবে বলে প্রত্যেক স্টেশনে পুলিশের কড়া পাহারা।

অরিন্দমের সে সব কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা আর নেই। সে দারুণ ঘামতে লাগলো। একবার ভাবলো ফিরে যাবে। একদল পুলিশ সেই মুহূর্তে স্টেশনের বাইরে যাওয়া সে আর বেরুতে সাহস করলো না।

সে আস্তে আস্তে একটা বেঞ্চিতে ঠেস দিয়ে বসলো। কোনোক্রমে একবার ট্রেনে উঠে পড়তে পারলেই হয়। তার হাতের সিগারেটটা কাঁপছে।

অরিন্দম যদিও আরও কিছুক্ষণ সময় পেত তা হলে মাথা ঠানডা করে সব দিক চিন্তা করতে পারতো। কিন্তু সে সময় পেল না। সে দেখলো, পুলিশের লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। সোজা তার দিকে।

ট্র্যাজিডি এই, অরিন্দম যেখানে দেয়ালের কাছে বেঞ্চিতে বসে ছিল সেখানেই তার মাথার ওপরে পুলিশ বিভাগের একটা নোটিশ লাগানো। পুলিশ দু'জন সেই নোটিশ পড়তেই আসছিল। তারা অরিন্দমকে কোনো রকম সন্দেহই করেনি। অরিন্দম তা বুঝতে পারলো না। পুলিশ দু'জন তার সামনে এসে পড়তেই সে উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধের মতন ছুটতে লাগলো।

কোথায় যেন একটা মাইক্রোফোন বাজছে; অরিন্দমের মনে হলো, সেই স্পাউড লাকারে ক্রমাগত বলা হচ্ছে, অরিন্দম পালাও। অরিন্দম পালাও!

তারপর তার মনে হলো, তার চারিদিকেই শত শত লাউড স্পীকার। তারপরে ঘোষণা করছে, অরিন্দম পালা অরিন্দম পালাও। কান ঝালপালা হয়ে যাচ্ছে।

সেই সময় অরিন্দমের ব্যবহার আলোর সামনে মৃত্যুমুখী পোকার মতন। সে যেন অন্ধ হয়ে গেছে। সে ভুলে গেছে স্টেশন থেকে বেরুবার পথ। এক এক সময় পুলিশের দিকেই ছুটে যাচ্ছে, যেন একটা ভয়ার্ত শিশু। খুব সামনা-সামনি এসে আবার উল্টো দিকে ফিরে দৌড়। অরিন্দমের মতন একজন পোড় খাওয়া বিপ্লবীও এখন কি অসহায়। মৃত্যু-চিন্তা গ্রাস করে ফেলেছে তাকে। সে শুনতে পাচ্ছে, চতুর্দিক থেকে হাজার হাজার লোক মাইক্রোফোনে তার নাম ধরে ডাকছে-তাকে পালাতে বলছে।

অরিন্দম এই মুহূর্তে আর কিছু চায় না, শুধু বেঁচে থাকতে চায়।

কোন দিকে পালাবে? অরিন্দম দেখছে, চতুর্দিকে পুলিশ। সে উদভ্রান্তের মতন ছুটছে এদিকে সেদিকে। একজন সার্জেন্ট তার হাত চেপে ধরতেই সে লাফিয়ে নেমে পড়লো, ট্রেন লাইনে পাগলের মতন ছুতে লাগলো।

ততক্ষণে সত্যি সত্যি অনেক পুলিশ তাকে তাড়া করেছে। একজন পা লক্ষ্য করে গুলি চালালো। অরিন্দম মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। সেই অবস্থাতেও সে মাটি ছেড়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো খানিকটা। জন তিনেক পুলিশ তাকে চেপে ধরতেই সে কাটা পাঠার মতন ছটফট করতে করতে বললো, আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও! আমি কিছু করি না!

একজন দারোগা সেই অবস্থাতেই অরিন্দমের গালে বিরাট এক চড় কষিয়ে বললো, কে তুই শীগগির বল।

আরেকজন তার টুটি চেপে ধরে দাঁড় করালো। সে বললো, সেই রেল-ডাকাতি? না?

-আমি কিছু করি না। 'আমি কিছু করি নি। আমাকে ছেড়ে দাও।

আর একখানা ঘুঁষি পড়লো তার মুখে। একজন তার জুলপি ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেললো সব কটা লোম।

মিনিট চল্লিশের বীভৎস অত্যাচার করার পর অরিন্দম একেবারেই ভেঙে পড়লো। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললো, আর মারবেন না। আমি সব বলছি।

সব্যসাচীকে পুলিশ ধরতে এলো বিকেলের দিকে। কোনোরকম গোপনীয়তা আবরণ নেই। দু'গাড়ি পুলিশ এসে বাড়ির সামনের রাস্তায় থামলো। তারপর তারা ধীরে সুস্থে ঘিরতে লাগলো বাড়িটা। তারা জেনেই এসেছে যে, আসামীর পালাবার ক্ষমতা নেই।

সব্যসচী তখন শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল্ একটু আগে সে কুন্তলার কোলে মাথা দিয়ে শোওয়ার আশা মিটিয়ে নিয়েছে। কুন্তলা নিজের থেকেই তার কোলে তুলে নিয়েছিল সব্যসাচীর মাথা। সব্যসাচী কুন্তলার গোছাগোছা কালো চুল তার নাকের কাছে এনে গন্ধ শুকেছে, আর বলেছে, আঃ "জীবনে আর আমার কিছুই চাইবার নেই।

এক সময় কুন্তলার দু'ফোটা চোখের জল কোনোক্রমে পড়ে গিয়েছিল সব্যসাচীর। মুখে। সে চমকে উঠে বলেছিল, একি? কুন্তলা, তোমার মনে কি কষ্ট দিয়েছি আমি? তুমি আমাকে ঘেন্না করছো?

-না।

-তবে তুমি কাঁদছো কেন?

-আমি ভাবছি, আমি একটা সামান্য মেয়ে! আমার জন্য আপনি এই রকম করছেন?

-কুন্তলা, আমিও তো সামান মানুষ। আমার লোভ আছে, কামনা আছে। দেশের কথা চিন্তা করেও আমি সব কিছু বিসর্জন দিতে পারি নি। আমি কি তোমার চোখে অনেক ছোট্ট হয়ে গেলাম?

-না। আমি সে কথা বলি নি!

-এরকম অসুস্থ হয়ে না পড়লে বোধ হয় আমি কখনো এতটা দুর্বল হয়ে পড়তাম না। কিন্তু তুমি আমাকে যা শাস্তি দিলে, তার তুলনাই নেই। আমি তো বেশি কিছু চাই নি! কুন্তলা মুখ নিচু করে বললো, আগে আমার ধারণা ছিল, এটা পাপ।

সব্যসাচী তেজের সঙ্গে বললো, পাপ আবার কি? পৃথিবীতে পাপ-পূণ্য কোনোটারই স্থির সংজ্ঞা নেই। মানুষ খুন করা কিংবা ডাকাতিও তো পাপ। কিন্তু আরও বড় পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমরা সেগুলোই আশ্রয় নিয়েছি। আমরা কোনো পাপ করছি না।

-আপনি বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

-কুন্তলা, আমাকে আপনি না বলে তুমি বলতে পারো না।

-আচ্ছা, কাল থেকে বলবো।

একটু আগে কুন্তলা চা তৈরি করে আনার জন্য নিচে নেমে গিয়েছে। যাবার আগে সে তার গালটা ঠেকিয়ে গিয়েছিল সব্যসাচীর কপালে-। সব্যসাচী এখনও অনুভব করছে সেই মাদকতা। এখনো তার নাকে লেগে আছে কুন্তলার শরীর ও চুলের ঘ্রাণ।

পুলিশ বাড়ির দরজায় ধাক্কা দেবার পর কুন্তলা দৌড়তে দৌড়তে ওপরে উঠে এসে কোনোক্রমে বললো, পুলিশ!

সব্যসাচী এক গাল হেসে বললো, আবার আমাকে ভয় দেখাচ্ছো শুধু শুধু?

কুন্তলার মুখখানা ভিজে কাগজের মতো নিষ্প্রাণ। সে বিস্ফরিত চোখ মেলে শুধু বললো, অনেক পুলিশ।

সব্যসাচী স্প্রিং এর মতন লাফিয়ে উঠলো। হঠাৎ তার গায়ে অসুরের শক্তি এসে গেছে। সে বললো, যাক অরিন্দমটা তবু বেঁচে গেল!

তারপর সে কোমর থেকে পিস্তল টেনে বার করলো।

কুন্তলা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বললো, আপনি এখন কি করবেন?

সব্যসাচী তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললো, কি আবার করবো? মরবো! তার আগে লড়াই করে মরবো!

-ওরা অনেক। অনেক পুলিশ।

- হোক। তোমার জামাইবাবু কোথায়?

-বাথরুমে!

-ব্লাডি ফুল! যাও শীগগির তাকে বেরোতো বলো। পুলিশকে যেন দরজা খুলে না দেয়। দরজা ভাঙুক। তুমি একটা মোটা দড়ি দিয়ে তোমার জামাইবাবুকে বেঁধে ফেল। পুলিশকে বলো, আমি তোমার জামাইবাবুকে বেঁধে রেখেছি। তারপর তোমাদের ভয় দেখিয়ে জোর করে এ বাড়িতে থেকেছি।

কুন্তলা তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে -সাব্যসাচী প্রচন্ড চিৎকার করে বললো, যাও!

খোলা পিস্তল হাতে সব্যসাচী দৌড়ে গেল ছাদের পাঁচিলের দিকে। উকি মেরে একবার দেখলো। পালবার কথা তার একবারও মনে এলো না। তার একমাত্র চিন্তা, লড়াই করে মরতে হবে। সুবিধা মতন একটা জায়গা বেছে নিল। তারপর রাস্তায় দাঁড়ানো অফিসটারটিকে টিপ করে গুলি চালালো।

গুলি চালিয়ে সে বসে পড়ে গেছে। তার গুলি কারুর গায়ে লাগেনি। ইস কেন যে বা হাতেও পিস্তল চালানো অভ্যেস করেনি সে।

ততক্ষণে ওদিক থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এসেছে। সব্যসাচী বসে আছে পাঁচিলের আড়ালে। পাচিলের মাঝে মাঝে ফুটো। একটা ফুটোয় চোখ রেখে আবার গুলি চালালো। কে জানে আর কারুর গায়ে লাগলো কিনা।

সব্যসাচী একটা একটা গুলির বিনিময়ে এদিকে ওদিকে থেকে পাঁচ ছটা গুলি ছুটে আসছে। সে যেন বেশ মজা পেয়েছে এতে।

দরজা ভাঙার চেষ্টা চলছে, শব্দ পাওয়া যাচ্ছে দম্ দম্! সব্যসাচী দরজার দিকে টিপ করে গুলি ছুড়লো। এবার কারুর না কারুর লেগেছে বোধ হয়। আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেছে। কুন্তলা কি তার

ইচ্ছে মতন জামাইবাবুকে বাঁধতে পেরেছে দড়ি দিয়ে। অরিন্দমটা যখন পালাতে পেরেছে তখন সব্যসাচীকে এ বাড়ির সঙ্গে যুক্ত করা চলবে না। তার মৃত্যুদেহ দেখে কুন্তলা বলবে, আমরা একে চিনি না।

সব্যসাচী শেষ গুলিটা নিজের জন্য রেখে দেবে ভেবেছিল, হঠাৎ দেখলো গুলি শেষ। ইস এটা একটা বিশ্রী ব্যাপার। তার কোমরে আরও গুলি জড়ানো আছে। কিন্তু এক হাতে গুলি ভরা অসম্ভব। চেষ্টা করেও সে পারলো না।

তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে পাঁচিলের এদিক ওদিক উঁকি মারতে লাগলো। তার মাথা একটু দেখা গেলেই গুলি ছুটে আসছে, কিন্তু তখন ওতে কিছু আসে যায় না।

বাড়ির পেছন দিকে একটা জায়গায় নোংরা, জল কাদা মতন। সেখানেও একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে লাফাবার শেষ চেষ্টা করা যায় বটে। কিন্তু তার একটা হাত একেবারে অচল। সে বুঝতে পারলাম এখান থেকে লাফিয়ে পড়লে সে সেই ধাক্কাতেই মরবে।

তখন হঠাৎ সব্যসাচীর মনে হলো, এভাবে মরে লাভ কি? ধরা পড়লে যদি ফাঁসিও হয়, তাহলেও তো কম পক্ষে আরও দু'এক মাস বেঁচে থাকা যাবে। তাই বা কম কি? একটা দিন বেঁচে থাকাও তো একটা দিন বেশি বেঁচে থাকা।

সব্যসাচী নিজের শরীরটার দিকে একবার তাকালো। খুব মায়া হলো তার। কত যত্নের এই জীবন সামান্য একটু সূচ ফুটে গেলেও ব্যথা লাগে, যত কামনা-বাসনা, ঈর্ষা-লোভ সবাই তো এই শরীরকে জড়িয়ে। এরই মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে? পরজন্ম বলে কিছু আছে কি নেই কে জানে।

বারবার সব্যসাচীর ছেলেবেলার কথা মনে পড়তে লাগলো। সে একটা পুকুরের ধারে বসে খেলা করতো। পুকুরের জলের কাছে মুখ ঝুঁকিয়ে নিজের ছায়াটা দেখতে খুব ভালোবাসতো সে। ঘন্টা পর ঘন্টা সেই ভাবেই বসে থাকতো আর নিজের সঙ্গে কথা বলতো। হঠাৎ সে কথাটাই এমন মনে পড়ছে কেন, কে জানে।

সব্যসাচী আবার চলে এলো সামনের দিকে। রিভলবারটা বাইরে রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে বললো আই সারেন্ডার।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। সব্যসাচী আস্তে আস্তে পাঁচিলের ওপর মাথাটা তুললো। অনেকগুলো বন্দুকের নল তার দিকে তাক করা।

সে একটা হাত মাথার ওপরের তুলে বললো, খুব দুঃখিত। আমার আর একটা হাত ভাঙা- সে হাতটা তুলতে পারছি না।

পাঁচিলের কাছে ঝুঁকে সে ব্যান্ডেজটা দেখালো।

রাস্তা থেকে একজন ইন্সপেক্টার জিজ্ঞেস করলো, নেম? শাউট দা নেম!

খুব জোরে চেঁচিয়ে সব্যসাচী বললো, ক্ষুদিরাম! আমার নাম ক্ষুদিরাম।

- স্টে দেয়ার! রেমেইন ভিজিবল!

ইংরেজ অফিসারটি তার পিস্তলের মুখ সোজা তাগ করে রেখেছে সব্যসাচীর কপালের দিকে। যে কোন মুহূর্তে গুলি ছুড়তে পারে। সব্যসাচীর এটা ভালো লাগছে না। সে আবার বসে পড়লো পাঁচিলের আড়ালে।

নিচের দরজা খুলে গেছে কিংবা এতক্ষণে ভেঙে ফেলেছে। আর বড় জোর এক মিনিট।

টাকাগুলো কি হবে?

পুলিশ তাকে ধরার পর কেড়ে নেবে। গর্ভণমেন্টের টাকা আবার গভর্ণমেন্টের ঘরে যাবে। তাহলে এত কষ্ট সব বৃথাইস অরিন্দম যদি টাকাগুলো নিয়ে যেত। কুন্তলার কাছে টাকাগুলো জমা রেখে কোনো লাভ হতো না। নিশ্চয়ই সারা বাড়ি সার্চ করবে।

তাহলে উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমো হয়ে যাক। সব্যসাচী মন ঠিক করে ফেলেছে।

দ্রুত সে কোমার থেকে টাকাগুলো বার করে ফেললো। তারপরে গোছা গোছা করে টাকাগুলো ওড়াতে লাগলো।

হওয়ায় বেশ জোর ছিল। নোটগুলো পাখির মতন উড়তে লাগলো হওয়ায়। পুলিশরা প্রথমে ইস্তাহার ভেবেছিল। তারপর তাদের সামনেই একশো টাকার নোট,উড়তে দেখে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল।

কিছুদূরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমেছিল। অনেক টাকা উড়ে গেল সেদিকেও একশো টাকার নোট দেখেও স্থির হয়ে থাকতে পারে ক'জন মানুষ। প্রাণভয় তুচ্ছ করেও অনেক হুটোপুটি করে কুড়োতে লাগলো সেই টাকা।

সব্যসাচী গোছা গোছা নোট জোরে জোরে ছুঁড়ে দিয়ে বলতে লাগলো, এই নাও! এই নাও!

চারজন পুলিশ ছাদের ওপরে এসে দৌড়ে গিয়ে যখন তাকে চেপে ধরলো, সে এক গাল হেসে বললো, সব শেষ!

॥ সাত ॥

কান্নার শব্দে রফিকের ঘুম ভেঙে গেল। পাশ ফিরে দেখলো, সুকুমার শিশুর মতন ফোঁপাচ্ছে।

রফিক উঠে তার গায় ধাক্কা দিয়ে বললো, এই সুকুমার! এই!

সুকুমার সাড়া দিল না।

রফিক তাকে আরও দু'চার বার ধাক্কা দিয়ে বললো, তুই স্বপ্ন দেখছিস নাকি?

সুকুমার নিঃশব্দে উঠে কুঁজো থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে খেল। চোখ-টোখ মুছে অনুতপ্তভাবে বললো, শুধু তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম রফিকদা।

-দিলিই তো! দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছিলাম। দে, আমাকে এক গেলাস পানি দে। একটা সিগারেট খেলে কেমন হয়?

সুকুমার এসে আবার খাটে বসলো। রফিক তার কাঁধে হাত চেপে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলো, কি স্বপ্ন দেখলি? খারাপ স্বপ্ন? আমি তো স্বপ্নই দেখি না রে। কত সাধ্য সাধনা করি! স্বপ্ন দেখলে বেশ ভালো স্বপ্ন দেখতে হয়। সেই যে গান আছে না, 'খেয়াব দেখেছি আমি বাদশা বনেছি।'

সুকুমার চুপ।

রফিক তার মন ভোলবার চেষ্টা করছে হালকা কথা বলে। কিছুতেই সুকুমার মুখ খুলছে না দেখে আবার বললো, তোর কি মায়ের কথা মনে পড়েছিল বুঝি? তুইতো তোর মায়ের এক ছেলে তাই না? দ্যাখ, আমরা পাঁচ ভাই, চার বোন- আমার মায়ের একটা ছেলে গেলে এমন কিছু আঘাত লাগবে না, কিন্তু তোর মায়ের একটাই ছেলে।

সুকুমার বললো,আমার মায়ের তেত্রিশ কোটি ছেলে।

-ওসব কথা শুনতে ভালো, তা বলে নিজের মনকে কি ভোলানো যায়? মাকে স্বপ্ন দেখছিলি?

-না।

-তবে?

-একজন নেপালী ভদ্রলোককে। মনে হচ্ছিল, তিনি ঠিক আমার খাটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

- সে আবার কে?

- সেদিন অ্যাকশানে যাকে তুমি আমি মেরেছি।

এবার রফিক একটু চুপ করে গেল। সিগারেটে ঘন ঘন টান দিল কয়েকবার। তারপর বললো, তুই তো একা কারুকে মারিস নি? সব কাজে আমাদের সমান দায়িত্ব।

-তবু বুলেটটা আমার হাত থেকেই বেরিয়েছিল।

-সেই কথা ভেবে তুই কান্নাকাটি করছিস? এত দুর্বল হলে চলে না।

- না, সে জন্য না। আমি দেখলাম ভদ্দরলোক এই খাটের পাশে এসে দাড়িয়েছেন, কপাল থেকে রক্ত ঝরছে-আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন আমাকে খুন করলে? আমি কি দোষ করছি?

- উনি আমাদের বাধা দিতে এসেছিলাম আমরা তো নিজেদের পরিচয় দিই নি। উনি আমাদের ভেবেছিলেন সাধারণ চোর-ডাকাত। কাপুষের মতন বসে না থেকে বাধা দিতে এসেছিলেন সাহস করে–

-সুকুমার, আমরা যা করতে চাইছি, সেটা মস্ত বড় কাজ। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এরকম দু'একটা ঘটনা ঘটবেই।

-তবু একটা কথা ভেবেই আমার কান্না আসছিল। ভদ্রলোক হয়তো দেশে ফিরছিলেন। নেপালে হয়তো ওর স্ত্রী ছেলেমেয়ে আছে। ছেলেমেয়েরা আশা করে আছে বাবা কবে ফিরবেন, বাবা কি কি উপহার আনবেন, এই সব কিছু নষ্ট হয়ে গেল আমার জন্য-ওরা কেউ জানতেও পারলো না–

সুকুমারের চোখে আবার জল এসে যাচ্ছিল, রফিক তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, এই কি হচ্ছে কি? এরকম কত লোক তো অ্যাকসিডেন্টে মরে। হঠাৎ একটা ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে ও দুশো লোক মারা যায়– তাদেরও বাড়িতে বৌ-ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করে থাকে। এরকমভাবে চিন্তা করে লাভ নেই। একটা কথা শুধু মনে রাখবি, আমরা যা করছি তা নিজেদের কোনো স্বার্থের জন্য বা লাভের জন্য করছি না। ঐ নেপালী ভদ্রলোকটির বিরুদ্ধে তোর, বা আমার কোনো ব্যক্তিগত রাগ নেই, সুতরাং এ ব্যাপারে আমরা নির্লিপ্ত।

রফিকদা, তুমি গীতা পড়েছো নাকি?

-না রে, আমি গীতা বা কোরান কিছুই ঠিক মতন পড়িনি। সাধারণ বুদ্ধিতে যা মনে হয় তা বললাম।

আমি বোধ হয় তোমাদের সঙ্গে কাজ করার উপযুক্ত নই। আমার বাবা ডাক্তারি পড়তে গিয়েও ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দিন মরা মানুষের গায়ে ছুরি চালাতে গিয়েই পড়ে গিয়েছিলেন অজ্ঞাত হয়ে। আমাদের বাড়ি সবাই দুর্বল। আমি মানুষের রক্ত দেখতে পারি না। রক্ত দেখলেই আমার মাথা ঝিমঝিম করে।

-আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

- কি জানি! আমার তো আর ফেরার ও উপায় নেই।

- তুই ফিরতে চাস?

- না তা ঠিক নয়।

- ফিরতে চাইলে উপায় থাকবে না কেন? অনেকেই তো এক আধবার জেল খেটে এ লাইন ছেড়ে দেয়। পুরোনো কথা সবই ভুলে যায়। ঐ নেপালী ভদ্রলোককে মারার ব্যাপারে তোর নাম কোনদিন কেউ জানতে পারবে না।

- যদি না আমাদের মধ্যে কেউ রাজসাক্ষী হয়।

- আমাদের দলে সেরকরম কেউ নেই। তুই আমার কথা শুনবি? আমার মতন লোকের পক্ষে এই সব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়াটাই একটু অদ্ভুত মনে হয় না তোর?

- কেন?

-প্রথমতঃ আমি মুসলমানের ছেলে। কংগ্রেস থেকেই মুসলমানরা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। বিপ্লবী দলে তো তারা গোড়া থেকেই চায় নি। বিটিশ সরকারও এখন তোয়াজ করছে মুসলমানদের। আস্তে আস্তে দানা বাধঁছে মুসলীম লীগ। ব্রিটিশ সরকার চাইছে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিতে, আমরাও সেই টোপ গিলে নিচ্ছি! স্বদেশী ছোকরা বলতো তো সাধারণ লোক হিন্দুর ছেলেদের বোঝে, তাই না? আমার ব্যাপারটা অবশ্য অন্য ছিল। আমি রাজনীতি-ফিরি নিয়ে মাথাই ঘামাতাম না। বাড়িতে টাকা পয়সার অভাব নেই, ফুর্তি-টুর্তি করে জীবন কাটাতাম– একটা হালকা অর্থহীন জীবন ছিল। তারপর সব্যসাচীর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর যখন সব কথা শুনলাম, এই দেশ ও দেশের মানুষকে চিনতে শিখলাম, আস্তে আস্তে কাজ শুরু করলাম, তখন বুঝলাম, এই জীবনে একটা অন্য রকম মানে আছে। এখন আমি সত্যিকারের আনন্দের মধ্যে আছি। মানুষের জন্য, পৃথিবীর জন্য কোনো কাজ করছি- এর ফলে বেঁচে থাকাটা ধন্য হয়ে গেল।

-কিন্তু রফিকদা, এইভাবে সত্যি কি কাজ করতে পারবো?

-সুকুমার, ,মনের মধ্যে সন্দেহ রাখতে নেই। আমাদের যার যতখানি সাধ্য কাজ করে যাবো। কিছু না কিছু ফল তাতে হবেই। যেন আর বক্‌বক্ করে লাভ নেই। ঘুমোতে হবে না?

রফিক সিগারেট নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। সুকুমারকে বললো, ফের যদি বাচ্চা ছেলের মতন কাঁদিতে দেখি, তা হলে গাঁট্টা খাবি কিন্তু আমার কাছে!

পরদিন সকালে রফিকেরই আগে ঘুম ভাঙলো। সুকুমারকে না জাগিয়ে সে উঠে বাইরে চলে এলো।

মুখ ধুতে ধুতে সে গেল রান্নাঘরে করিম যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। এত ভোরে আবার কে এলো? করিম কি নিজের মনে মনেই বক্‌বক্ করে নাকি?

রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখলো করিম টোস্ট সেঁকেছে আর তিশন্‌না একটু টুলে বসে পা দোলাতে দোলাতে চাকুস চাকুস করে কি যেন খাচ্ছে।

-এই তুমি এত ভোরেই এখানে চলে এসেছো?

তিশনা চমকে উঠলো। হাতের বিস্কুটগুলো সব মুখে ভরে দিয়ে এক সঙ্গে চিবোতে গিয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তারপর ঢোক গিলে বললো, ভোর কোথায়? এখন তো সাড়ে সাতটা।

-হলোই বা সাড়ে সাতটা। ঘরের কাজকর্ম কি নেই?

-আমি করিম চাচার কাছ থেকে চা খেতে এসেছি। আমাদের ঘরে তো চা হয় না।

-করিম ভাইয়ের সঙ্গে খুব ভাব দেখছি। প্রত্যেক দিন আমার ঘরের চা বিস্কুট খেয়ে যাওয়া হয়।

করিম এক গাল হেসে বললো, তার বদলে এই বেটি আমাকে ঘি মাখন এনে দেয়। তিশ্‌নার বাবার ঘি-মাখনের ব্যবসা। ইদানিং অবস্থা বেশ ভালো হচ্ছে।

রফিক বললো, বাঃ চমৎকার ব্যবস্থা দেখছি। একজন মালিকের চা-বিস্কুট অন্যকে দান-খায়রাত করেছে, আর একজন নিজের ঘর থেকে ঘি-মাখন চুরি করছে! দাঁড়াও তোমার দাদিকে বলে দেবো!

-দাদি এখন কানেই শুনতে পায় না।

করিম চা ভিজিয়েছে। ছাকবার আগে সে জিজ্ঞেস করলো, তোমার দোস্তকে ডাকবে না?

-না ও পরে নাস্তা করবে। এখন একটু ঘুমোক।

-তুমি বসো, আমি তোমারটা দিয়ে দিই।

রফিক খাবার টেবিলে গিয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসলো। নানান খবরের পুলিশের ধরপাকড়ের বিবরণ কিন্তু তাদের দলের একজনেরও নাম কোথাও নেই। আসানসোল আর বর্ধমানের দুটো ঘটনা দিয়ে ক'দিন ধরে খুব লেখালেখি হচ্ছে।

টেবিলের চায়ের কাপ রাখার শব্দ হতেই রফিক সে দিকে না তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে কাপটা নিয়ে এসে অন্যমনস্কভাবে চুমুক দিল। তারপর আবার একটা শব্দ হতে সে চোখ তুলে তাকালো। দেখলো আন্ডার পোচ সমেত প্লেট হাতে নিয়ে তিশ্‌না দাঁড়িয়ে আছে। তিশ্‌না জিজ্ঞেস করলো,আগেই চা খেতে শুরু করলেন? আন্ডা খাবেন না?

-তুমি এসব আনলে কেন? করীম কোথায়?

- কেন, আমার হাতের খাবার আপনি খাবেন না?

-ঠিক আছে, রাখো।

-রফিকভাই, আপনার মনটা সব সময় কোথায় থাকে?

রকিফ এবার কাগজটা সরিয়ে রেখে হাসলো। তারপর বললো, তোমাকে আমাদের এখানে বেশি আসতে বারণ করেছি না?

-আপনি দিনে একবার আসতে বলেছেন, এই তো একবারই এসেছি।

-তা বলে এই সকালবেলা! তুমি লেখাপড়া করো না?

-করেছি তো! উঠেছি সেই কখন। তারপর এক ঘন্টা বই পড়লাম, তারপর তো চা খেতে এলাম!

-আমি যখন এখানে থাকি না, তখনও কি তুমি চা খেতে আসো।

- শোনো কথা! আপনি না থাকলে করীম চাচা চা বানাবে কার জন্যে? তখন তো চা হয়ই না।

-আমার চাচাজী যখন থাকেন?

-আপনার চাচাজীকে দেখলেই আমার ভয় হয়। ভীষণ গম্ভীর। আপনি বড্ড কম আসেন। আপনি ঘন ঘন আসেন না কেন?

-যাতে তুমি বেশি করে চা খেতে পাও?

-না, যাতে আপনাকে বেশী করে দেখতে পাই।

-এই মেয়েটা আচ্ছা পাগলী! আমাকে দেখে কি হবে?

-আপনাকে দেখলে যদি আমার ভালো লাগে, তাতে ও আপনি রাগ করবেন।

-ওরকম ভালো লাগতে নেই। তোমার বাবা-জানকে আমি বলে দেবো, যাতে শিগগিরই তোমার শাদী দিয়ে দেয়।

বিয়ের কথায় তিশনার মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। সে মাথা নীচু করে আঙুল বুলোতে লাগলো টেবিলে। তারপর ফিসফস করে বললো, আমি শাদী করবো না।

-ইস্! দেখা যাবে! যাই হোঁক আমাদের কথা কারুকে বলো নি তো?

-না কারুকে না! সবাইকে আপনার কথা বলতেই ইচ্ছে করে, খুব ইচ্ছে করে, তবু বলিনি। কিন্তু আপনি যে এসেছেন, তা তো অনেকেই জানে!

-তা জানুক। আমার ছোট ভাইটির কথা কেউ জানে না তো?

-না।

-ঠিক আছে।

-রফিক ভাই, আমি এখানে একটু বসি?

রফিক বসতে বলেনি বলে তিশ্না দাঁড়িয়ে আছে। রফিক বললো, হ্যাঁ বসো। একটা আন্ডা আর টোস্ট খাও।

-আমি আর কিছু খাবো না। অনেক খেয়েছি।

-খেতেই হবে তোমাকে। না খেলে জোর করে খাওয়াবো। তারপর খাওয়া হলেই নিচে চলে যাবে। আমাদের এখন অনেক কাজ আছে।

সেদিন বেলার দিকে পাড়ার ক'জন প্রবীণ লোক দেখা করতে এলো রফিকের সঙ্গে। রফিক সুকুমারকে লুকিয়ে রাখলো ঘরে, পড়শীদের সঙ্গে কথা বললো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

যারা এসেছে, তাদের বলার কথা বিশেষ কিছু নেই। চাচা কেমন আছে, বাড়ির খবর কি, গভর্ণমেন্ট থেকে নতুন আইন হচ্ছে, সব কলেজে পড়া ছেলেদেরই থানায় নাম লিখিয়ে আসতে হবে? এইসব অবান্তর প্রসঙ্গ। আসল ওরা কৌতুহলী! রফিক কেন দিনের পর দিন চুপচাপ ঘরে বসে আছে, তাই জানতে চায়।

রফিক বুঝতে পারলো, এই একম করলে বেশিদিন লোকের সন্দেহ এড়ানো যাবে না। সেদিন সে দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। চারদিকে একটু ঘুরে-টুরে দেখে বুঝলো বিপদের গন্ধ নেই। এ পাড়ার দিকে পুলিশও তেমন নজর রাখেনি।

পরদিন আর একটু সাহস করে সে গেল খিদিরপুরের ডক এলাকায়। পুরোনো লোকদের খুঁজতে লাগলো। আগ থেকেই সে সন্ধান রেখেছিল যে এখানে কিছু চোরাই অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। তার কিছু ডিনামাইটের স্টিক দরকার। সম্প্রতি ভুটানের রাজা আমেরিকা থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র আনিয়েছে। সেই জাহাজ এখনো ভিড়ে আছে ডকে। মাল খালাস শেষ হয়নি। এর থেকে দু'একটা পেটি সরাতে হবে।

আস্তে আস্তে রফিক যোগাযোগ গড়ে তুললো। তিন চারজন স্মাগলার, যারা সাবান সেন্ট আর স্কচ হুইস্কির চোরাই ব্যবস্থা করে, তারা এই ঝুঁকি নিতে রাজি আছে। কিন্তু আগে থেকে অনেক টাকা ঢালতে হবে।

এই টাকার ব্যাপারটা নিয়েই রফিক একটু মুশকিলে পড়লো। তার কাছে এক লাখ দশ হাজার টাকা আছে-আপাতত এই কাজের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এই টাকা সে তো নিজের ইচ্ছে মতন খচর করতে পারে না। পার্টির কাছে তাকে পাই-পয়সা পর্যন্ত হিসেবে দিতে হবে। টাকা-পয়সা জিনিসটা বড় নোংরা। সামান্য করণেই লোক বদনাম দেয়।

তাছাড়া, একবার টাকা ছড়াতে শুরু করলেই স্মাগলারগুলো গন্ধ পেয়ে যাবে, তাকে আরও চাপ দিতে শুরু করবে। তাই ইচ্ছে, কাজ শেষ হবার পর মাল পেলে হাতে হাতে টাকা দেবে। ওরা তাতে রাজী নয়। ওরাও রফিককে বিশ্বাস করতে পারছে না, রফিকও ওদের বিশ্বাস করতে পারছে না।

ওদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য রফিক অনবরত ওদের সঙ্গে মিশতে লাগলো। বেশিদিন সময়ও হাতে নেই। কলকাতার নানা জায়গায় সে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

স্মাগলারদের ক্ষমতা দেখে রফিক আশ্চর্য হতে লাগলো অনবরত। যে লোকটাকে সে রাত্তিরে দেখলো নোংরা বস্তির মধ্যে খেলাঘরে বসে দেখি মদ খাচ্ছে আর সস্তা মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করছে-সেই লোকটাই পরদিন সকালে স্যুট টাই পরে গ্রাণ্ড হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে গিয়ে একটা ঘরে ঢোকে-গুরুত্বপূর্ণ একজন লোকের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেয় রফিকের। ডক এলাকার পুলিশের সঙ্গে ওরা ইয়ার-দোস্তের মতন কথা বলে।

শেষ পর্যন্ত কিছু টাকা আগে দিতে সে রাজী হলো। ওদের বিশ্বাস না করলে জিনিসগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। রফিকের ইচ্ছে ছিল, টাকা পয়সা সে অন্যদের দেবার সময় সুকুমারকে স্বাক্ষী রাখে। সে একজনকে দশ হাজার টাকা দেবে-কিন্তু পরে যদি পার্টির কেউ এ ব্যাপারে তাকে অবিশ্বাস করে? পাঁচ হাজার দিয়ে সে দশ হাজার বলছে না, তা প্রমাণ কি? স্মাগলাররা তো আর রসিদ দেয় না!

কিন্তু সুকুমারের বাড়ি থেকে বার করায় বিপদের ঝুঁকি আছে। এ পাড়ায় সুকুমারকে কেউ চেনে না। তাকে কয়েকবার আনাগোনা করতে দেখলেই লোকে নানারকম সন্দেহ করবে। সুকুমারকে নিরাপদ রাখতে হবে। আর একটা উপায় হলো, স্মাগলারদের মধ্যে দু'একজনকে তার বাড়িতে নিয়ে আসা। তাহলে ওরা বাড়ি চিনে যাবে।

স্মাগলারদের সঙ্গে মিশে রফিক আর একটা জিনিস জানতে পারলো। ওদের আর একটা বড় ব্যবসা মেয়ে-চালান দেওয়া। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়ে সংগ্রহ করে ওরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, এবং আরবের দেশগুলোতে চালান দেয়। বিশেষ করে আরব দেশগুলো থেকে যে চোরাই সোনার বাটগুলো আসে তা শোধ দেয় ওরা মেয়ে পাঠিয়ে।

ব্যাপারটা জানতে পেরে রাগ ও ঘেন্নায় রফিকের শরীর জ্বলতে লাগলো। এদের বিবেক বলে কিছু নেই। এদের সঙ্গে তাকে হেসে কথা বলতে হবে? এদের শাস্তি দেবার জন্য তার হাত নিশপিশ করছে। কিন্তু তার কিছু সাধ্য নেই। সে পুলিশের কাছে যেতে পারবে না কারণ নিজেই পুলিশের কাছ থেকে পলাতক। তা ছাড়া এদের সাহায্য ছাড়া অস্ত্র পাবার আর কোনো উপায় নেই। পরাধীন দেশে চোরা চালান ছাড়া অস্ত্র পাবার আর কি পথ? জার্মানি জাহাজ ভর্তি অস্ত্র পাঠাবে বলে কি ধোঁকাই দিল। নরেন ভট্টাচার্যের সব চেষ্টা বিফলে গেল। বাঘা যতীন শুধু শুধু প্রাণ দিলেন। রফিককে এদের ওপরেই নির্ভর করতে হবে। দেশ স্বাধীন হোক, তারপর নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে এইসব সমাজ বিরোধীদের।

ব্যবস্থা অনেক পাকা হয়ে গেছে। তিন দফায় ওদের দু'জনকে বাড়িতে নিয়ে এসে সুকুমারের সামনে টাকা দেওয়া হয়েছে। সাফল্য সম্পর্কে ওরা নিশ্চিত।

একদিন রাত দশটরা সময় রফিক বাড়ি ফিরে দেখলো প্রধান দরজাটা খোলা, বারান্দাটা অন্ধকার, তার ঘরে দরজার বাইরে তিশ্‌না দাঁড়িয়ে আছে খাবার ঘর থেকে নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে করীমের -সে খাবার বেড়ে রেখে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রফিক কোনো শব্দ করলো না। দেখতে চায় তিশ্‌না কি করে।

দরজাটা ভেজানো ছিল, তিশ্‌না আস্তে আস্তে সেটা ঠেলে খুললো। সুকুমার চমকে জিজ্ঞেস করলো, কে?

তারপর তিশ্‌নাকে দেখে বললো, ও আপনি।

তিশ্‌না জিজ্ঞেস করলো, রফিকভাই ফেরেন নি?

-না।

তবু তিশ্‌না চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সুকুমার মুখ নীচু করে আছে।

আড়াল থেকে লক্ষ্য করে কৌতুক বোধ করলো রফিক। সুকুমারটা নিতান্তই বাচ্চা। এখানো মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেই শেখে নি। তিশ্‌নার সঙ্গে কথা বলার মতন একটাও কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

দরজার কাছে তিশ্‌নাকে ঐ রকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রফিকের একবার সন্দেহ হয়েছিল, এই ক'দিন তিশ্‌না বুঝি সুকুমারের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে।

তিশ্না বললো, আচ্ছা আমি যাই। তারপর সবে এলো দরজার কাছে থেকে। হঠাৎ রফিককে দেখতে পেয়ে দারুণ চমকে উঠলো। সে বললো, আপ্নি?

-তুমি এত রাত্রে কি করছো?

-আমি মানে, দেখতে এলাম আপনি ফিরেছেন কিনা?

-ছিঃ তিশ্না, তুমি তো খুব ছোটটি নাও, এত রাত্রে আসতে নেই, তা জানো না?

কেউ দেখে ফেললে কি মনে করবে?

-কেউ দেখে নি। আমাদের বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে আছে। আপনি বলেছিলেন, দিনে একবার আসতে। আজ সারাদিনে আপনাকে একবারও দেখি নি। সেই ভোরবেলা বেরিয়ে গেছেন- আপনাকে একবার অন্ততঃ না দেখলে আমার ভালো লাগে না।

রফিক একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তিশ্নার দিকে। রাত্রে ফোটা ফুলের মতন ফুটফুটে মুখখানি, মাথা-ভর্তি ঘন চুল। একটা শালোয়ার কামিজ পরে আছে, তার শরীরটি যেন কোন শিল্পীর সৃষ্টি। তার শরীর থেকে মিষ্টি সুগন্ধ ভেসে আসছে।

রফিক বললো, আজ এত সাজগোজ করে এসেছো যে?

তিশ্না লজ্জা পেয়ে বললো, আপনি আমার এই নতুন পোশাকটা দেখেন নি তো, সেইজন্য

-আতর কিংবা সেন্ট মেখে এসেছো?

তিশ্না চুপ।

রফিক তিশ্নার কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, এইসব দেখলে পুরুষ মানুষের মাথা ঘুরে যায়। তিশ্না তুমি আমাদের মাথা ঘোরাতে এসো না। আমাদের এখন অনেক কাজ।

-সারাদিন কি এত কাজ করেন?

-সে তুমি বুঝবে না।

রফিকের হাতের স্পর্শ পেয়ে তিশ্নার শরীরটা কাঁপছে। সে কোনো কথাই বলতে পারছে না।

রফিক বললো, তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। তোমার এবার শাদী হওয়া দরকার। আমি তোমার জন্য খুব ভালো দুলহান খুঁজে এনে দেবো।

হঠাৎ তিশ্না কাঁদতে আরম্ভ করলো। শব্দ করছে না। শুধু তার শরীরটা দুলে দুলে উঠছে। রফিক অবাক হয়ে বললো, কাঁদছো কেন? একি, আচ্ছা পাগলী মেয়ে তো, এতে কান্নার কি আছে?

-আপনি আরেকদিনও আমাকে এই কথা বলেছেন। আপনি শুধু আমার মনে কষ্ট দিতে চান।

-কিসে কষ্ট দিলাম?

-আপনি খালি-খালি আমার শাদীর কথা বলেন। আপনি ভালো করেই জানেন, আমি অন্য কারুকেই শাদী করবো না।

-অন্য কারুকে-তার মানে কাকে শাদী করবে?

-আপনি বোঝেন না? সত্যি কথা বলুন!

- আমাকে? ধুৎ! এসব চিন্তা মাথা থেকে একেবারে মুছে ফ্যালো। আমার পক্ষে শাদী-টাদী করা একেবারে সম্ভব নয়। আমি যদি জেলে যাই, তুমি সহ্য করতে পারবে?

- আমি সব সহ্য করবো!

-আমি যদি অনেকদিন আর না আসি?

-আমি অপেক্ষা করে থাকবো।

রফিক একটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। এই সরল প্রাণ মেয়েটিকে সে আঘাত দিতে চাইছে না।

সে তিশ্নার থুতনিতে আঙুল দিয়ে উঁচু করে বললো, তিশ্না, এখন আমরা একটা খুব বড় কাজ নিয়ে আছি। এখন এসব নিয়ে চিন্তা করারও আমার সময় নেই। আজ থেকে ঠিক এক বছর বাদে আমি এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবো। এই এক বছরের মধ্যে তুমি এই নিয়ে

একদম ভাববে না, রাত্তিরবলা গায়ে সুবাস মেখে এসে আমাকে ভোলাতেও চাইবে না। কথা দাও?

-এক বছর পরে আপনি ঠিক আসবেন!

-যেখানেই থাকি, এক বছর পরে ঠিক আসবে?

-মনে থাকবে?

-হ্যাঁ, মনে থাকবে।

সেইদিনই শেষ রাত্তিরে সুকুমারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রফিক। এক পেটি অস্ত্র পাওয়া গেছে। সাতাশটা পিস্তল, তের হাজার কার্তুজ, সাতটা গ্রেনেড আর এক ডজন ডিনামাইট স্টিক। এগুলো পেলে পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা আবার আগুন জ্বালাতে পারবে! ইউ পি-তে শচীন সান্যালের ভাঙা দলটাকে আবার জোড়া লাগানো দরকার। চট্টগ্রামে সূর্যবাবুও তৈরি হচ্ছে।

রফিক বললো, সুকুমার সকালের ট্রেনেই একটা দিল্লীর টিকিট কাটা আছে। আমাদের মধ্যে একজন যাবে। কে যাবে, তুই না আমি?

-দু'জন এক সঙ্গে যাওয়া যাবে না?

-না। দু'জনে আলাদা আলাদা গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। একজন ধরা পড়েলও অন্ততঃ আর একজন বাইরে থাকবে।

-তা হল কে যাবে. আপনি ঠিক করে দিন। আমি রাজী আছি।

-জিনিসটা নিয়ে তুই আগে চলে যা। আমি কয়েকদিন পরে যাবো। এর মধ্যে রতনলালকে একটা খবর দিতে হবে। তা ছাড়া, জিনিসগুলো, যোগাড় করার সময় আমি স্মাগলারদের সঙ্গে ঘুরেছি, পুলিশের চোখ পড়তে পারে আমার ওপর। আর ঐ স্মাগলাদের কোনো বিশ্বাস নেই। ওদের কেউ ধরা পড়লে, সেই হয়তো আমার নাম বলে দেবে। সেই জন্য মালটা আমার সঙ্গে না থাকাই ভালো। টিনের একটা ট্রাঙ্ক কিনে রেখেছি, তাতে ভরে নিয়ে যাবি-তোকে কেউ সন্দেহ করবে না।

-পাঞ্জাবে গিয়ে কার সঙ্গে দেখা করবো? ভগৎ সিং তো জেলে। আজাদজীর দেখা কি পাবো?

-তোকে সোজা পাঞ্জাবে যেতে হবে না। আগ্রায় নেমে পড়বি। সেখানে গিয়ে উঠবি সুকুমের হোটেলে। সেখানে থেকে ওরা তোকে নিয়ে যাবে। তবে, তুই চন্দ্রশেখর আজাদ ছাড়া আর কারুর হাতে জিনিসগুলো দিবি না। আজাদজীর সঙ্গে আমার সেই রকম কথা আছে।

-ঠিক আছে।

খিদিরপুরে এসে ওরা একটা নৌকোয় চেপে বসলো। তখনো ভোরের আলো ফোটে নি। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সমস্ত শহরটা ঘুমন্ত।

যাতে পোর্ট কমিশনের লঞ্চের নজরে না পড়ে যায়, সেইসঙ্গে তাদের নৌকাতে আলো জ্বালাও হয় নি। হাওড়া ব্রিজ এখন খোলা।

নৌকা এসে থামলো শিবপুরের বোটানিক্যাল বাগানের পেছনে দিকে। সেখানে আর একটা নৌকোয় অন্যরা অপেক্ষা করছিল।

রফিককে সেখানে এক লক্ষ্য টাকা তুলে দিতে হলো ওদের হাতে। টাকাগুলো গুণে গুণে নিল ও পক্ষের চারজন। রফিকও তেমনি ট্রাঙ্ক খুলে অস্ত্রগুলো গুণে গেঁথে মিলিয়ে নিল। সুকুমার দেখে নিল, জিনিসগুলো খাঁটি কিনা?

তারপর যে যার ছড়িয়ে পড়লো। জাহাজ থেকে অস্ত্রগুলো উধাও হবার খবর জানাজানি হয়ে গেলেই পুলিশ দারুন তৎপর হয়ে উঠবে। তার আগেই পালাতে হবে।

সুকুমার আর রফিক একটা রিকশা নিয়ে গেল কিছুটা পথ। তারপর একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল সৌভাগ্যক্রমে। হাওড়া ষ্টেশনে যখন পৌছালা, থখন সবে ভোর হয়েছে।

হাওড়া ষ্টেশনের থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে সাধারণত ভিখির আর ভবঘুরেরা রাত কাটাতে আসে। তারা অনেকেই ঘুমোচ্ছে। ওরা দু'জনেও তাদের পাশে শুয়ে পড়লো। রফিকের চেহারা এতই সুন্দর সে ওখানে তাতে কিছুতেই মানায় না। যে-কেউ তাকে দেখলেই সন্দেহ করবে।

শেষ পর্যন্ত ট্রেনের সময় হলো, কোনো কিছুই এর মধ্যে ঘটলো না। সুকুমারকে একটা থাউ ক্লাস কামরায় তুলে দিল রফিক। গোলাপ ফুল আঁকা টিনের ট্রাঙ্কটা ঢুকিয়ে রাখলো বেঞ্চের নিচে। তারপর বললো, ঠিক আছে?

সুকুমার বললো, ঠিক আছে। তুমি কিছু চিন্তা করো না।

- সাবধানে থাকিস।

-তুমি ও সাবধানে থেকো রফিক ভাই।

সুকুমারে ট্রেন ছাড়বার পর রফিক প্ল্যাটফর্ম বদলালো। সে একটা লোকাল ট্রেনে চেপে বসলো।

॥ আট ॥

রতনলাল বাংলাদেশ ছেড়ে বিহার চলে এসেছে। কিন্তু বেশী দূরে যেতে পারছে না। টাকাগুলোর চিন্তা তার মনের মধ্যে সব সময় আলপিন ফোটাচ্ছে। প্রায় একজন ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের হাতে টাকাগুলো রেখে আসতে হলো। সে যদি ফেরত না দেয়?

রতনলাল এসে উঠলো ধানবাদে। দু'দিন বাদেই সে একবার আসানসোলে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছিল। কুমারডুবির কাছাকাছি পর্যন্ত গিয়ে বুঝেছিল পুলিশ এত কড়া নজর রেখেছে যে সে চোখ এড়াতে পারবে না।

রতনলালের নিজের কাছেই এখন খরচ চালাবার মতন টাকা পয়সা নেই। অন্য কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না। খড়গপুরের একটা বাড়ির আর দু'দিন পরে সকলে এসে মিলিত হবার কথা। কিন্তু রতনলাল যে ধানবাদ থেকে কড়গপুরে যাবে, সেই ট্রেন ভাড়াই নেই। আসানসোল ষ্টেশনেই যদি গোলমালটা না হতো, তাহলে সে শ্রীরামপুরে আগে থেকে ঠিক করা আস্তানায় বেশ আরামেই থাকতে পারতো।

একজন সহৃদয় বিহারী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হবার পর রতনলাল লজ্জা-টজ্জা ত্যাগ করে কিছু সাহায্য চাইলো। সে বললো,যে চাকরি খোঁজার জন্য সে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পরেড়ছিল তারপর চোরে তার সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেছে।

ভদ্রলোক ওর কথা বিশ্বাস করলেন, বাড়িতে নিয়ে এসে পেট বলে খাওয়ালেন, আর দশটা টাকা দিলেন। তার পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত, এই নিরীহ চেহারার বিনীত ছেলেটির কোমরে একটা পিস্তল গোঁজা আছে।

খড়গপুরে ট্রেনে আসতে হলে আসানসোলের ওপর দিয়ে গিয়ে বর্ধমানে আবার বদলাতে হবে। কিন্তু রতনলাল আসানসোল পার হওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইলো না। ষ্টেশনে যেটুকু সময় ট্রেন দাঁড়াবে, সেই সময় কোনোক্রমে যদি কেউ তাকে চিনে ফেলে? এর সম্ভাবনা খুব কম হলেও বলা তো যায় না। পুলিশের হাতে সে কিছুতেই ধরা দেবে না। খড়গপুরে মিটিংটা সেরে নিয়েই সে যুক্ত প্রদেশের দিকে পাড়ি দেবে। তার আগে টাকাটা উদ্ধারের ব্যবস্থা একটা করতেই হবে অবশ্য।

অনেক ঘোরাপথে সে খড়গপুরের দিকে রওনা হলো দু'দিন আগেই। বার বার বদল করে এবং অনেক জায়গা পায়ে হেঁটে সে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল ঠিক।

ওদের দলের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন লোকের নাম অশ্বিনী ঘোষ, তার একটা বাড়ি আছে এখানে। সেই বাড়িতে এসে মেলার কথা। এই বাড়িতে আগেও তিনবার এরকম মিটিং হয়েছে। অশ্বিনী ঘোষ সে সব সময় কলকাতায় থাকে-দৈবাৎ পুলিশ এ বাড়ি সন্ধান পেয়ে গেলেও সে যাতে বলতে পারে যে এসব তার অজ্ঞাতসারে হয়েছে।

রতনলাল সতর্কভাবে বাড়িটার দিকে এগোলো। সন্ধে হয়ে এসেছে। বাড়িটা শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে। রতনলাল দেখলো, তার আগে আগে লম্বা মতন একজন হেঁটে যাচ্ছে।

আর একটু এসে তাকে চিনতে পেরে সে চেঁচিয়ে ডাকলো, রফিক?

রফিক ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, রতনদা? উঃ মনে হচ্ছে যেন কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম! গোঁফটা কোথায় গেল?

-উড়িয়ে দিলাম।

–খবর সব ঠিক আছে তো?

-না, রে, ঠিক নেই।

দু'জনে অল্পক্ষণে মধ্যেই পরস্পরের কাহিনী শুনে নিল। রফিক অনেক কিছু করেছে। টাকাটার সৎ ব্যবহার করতে পেরেছে। রতনলাল কুণ্ঠিতভাবে বললো, আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। টাকাটা এমন জায়গার রেখে আসতে বাধ্য হলাম –

-রতনদা, তোমার চেহারা একি হয়েছে? এই কদিনেই?

- আরে, রাখ চেহারা! টাকাটার জন্য।

-অত ভেবো না। ঠিক উদ্ধার করা যাবে। সব্যসাচীর কোনে খবর পেয়েছো?

-না। তবে সব্যসাচী আসবে নিশ্চয়ই আজ। ও যেখানেই থাক ঠিক আসবে। আমি যে আসতে পেরেছি--

-আমাদের কেউ ধরা পড়েনি তো?

-কিছুই তো খবর পাইনি। আমরা অবশ্য অনেকটা আগে এসে গেছি, নটার সময় সবার আসার কথা।

-চলো, ভেতরে গিয়ে বসি। যদি দরজা খোলা থাকে –

বাড়িটা একবারে অন্ধকার। সদর দরজা বন্ধ তাকার কথা। অরিন্দম এসে চাবি খুলবে। কিন্তু দরজাটা একটু ধাক্কা দিতেই খুলে গেল।

ভেতরটা আরো অন্ধকার। তবু ওরা ঢুকে পড়লো ভেতরে। রফিক পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালালো। বাড়িটার অনেকগুলো সুবিধে আছে। দোতলায় মেথরদের ওঠবার জন্য আর একটা সিঁড়ি আছে, হঠাৎ কোনো বিপদ দেখা দিলে পেছন দিক দিয়েও পালানো যায়।

বারান্দা পেরিয়ে একটা ছোট উঠোন। সেখানে সামান্য একটা চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতে দেখা গেল, অরিন্দম দাঁড়িয়ে আছে।

রতনলাল খুশী হয়ে বললো, এই তো অরিন্দম এসে গেছে। আলো জ্বালো নি কেন?

অরিন্দম কোনো উত্তর দিল না। কয়েকদিনে সে দারুণ রোগা হয়ে গেছে। মুখখানা অসম্ভব বিবর্ণ। যেন সে দাঁড়িয়ে থাকতেই পারছে না।

রতনলাল আবার জিজ্ঞেস করলো, সব্যসাচী কোথায়? সে আসবে না?

অরিন্দম এবার ঠোঁট নাড়লো, কিন্তু কি বললো, বোঝায় গেল না।

রফিক বললো, আপনার কি হয়েছে? আপনি এরকম করছেন কেন?

ফ্যাকাসে চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে অরিন্দম, রফিক আর রতনলাল এগোচ্ছে তার দিকে। ওদের দু'জনের জুতোর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। অরিন্দমকে দেখে খুশী হয়েছে রতনলাল, সে ওকে আলিঙ্গন করার জন্য হাত বাড়ালো।

এক পা পিচিয়ে গেল অরিন্দম। রতনলাল একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার? কিছু খারাপ খবর আছে? সব্যসাচী কোথায়?

হঠাৎ অরিন্দম চেঁচিয়ে উঠলো, পালাও! শিগগির-এখনো পালাও!

রতনলাল ঘুরে দাঁড়াবার সময় পেল না। তিনজন পুলিশ অফিসার বাঘের মতন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রচণ্ড শক্তিতে সে ঝটকা দিয়ে তাদের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলো, যদি অন্তত কোমর থেকে পিস্তলটা টেনে বার করতে পারে। পারলো না তাও, শিক্ষিত পুলিশ তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে পিস্তলটা সরিয়ে ফেলল প্রথমেই। হাতে হাতকড়া পরালো।

রফিককেও দু'জন জড়িয়ে ধরেছিল, কিন্তু সে কোনেক্রমে পিছলে বেরিয়ে গেল। পিস্তলটা বার করেই সে গুলি চালালো অন্ধকারের মধ্যে। কার যেন লাগলো। সে দৌড়ালো দরজার দিকে। একজন পুলিশ সেখানেও ছিল, রফিক আবার গুলি চালাতেই সে সরে গেল। তারপর রফিক বাইরে বেরিয়ে যেন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। অনেকগুলো পুলিশ তাকে খোঁজাখুজি করলো অনেকক্ষণ ধরে। আর পাওয়া গেল না।

হাত দুটো বাঁধা পড়ার পরেও রতনলাল ছটফট করছে, পুলিশরা তার ঘাড়ে রদ্দা মেরে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলো। তাকে ঠাণ্ডা করা সহজ কথা নয়।

সে অরিন্দমের দিকে চোখ রাখতে পারলো না। মুখ ফিরিয়ে বললো, তুই--তুই--

অরিন্দম সেদিকে চোখ রাখতে পারলো না। মুখ ফিরিয়ে নিল।

হাতকড়া বাঁধা হাত নিয়েই রতনলাল ঝাঁপিয়ে পড়লো অরিন্দমের ওপর। বোধ হয় সেও টুটি ছিড়ে দিত, তার আগেই একজন পুলিশ পিস্তলের বাঁট দিয়ে তার মাথায় মেরে তাকে অজ্ঞান করে, ফেললো।

ঐখানে আর একটু পরে ধরা পড়লো নিরঞ্জন, বাবুল আর নিমাই। ওরা নিজেরাই এসে যেন ফাঁদে পা দিল।

একদিন খড়গপুরে রেখে ওদের নিয়ে আসা হলো কলকাতায়। রতনলালকে রাখা হলো সাত নম্বর সেলে।

সেখানে এসেই রতনলাল শুনলো, সব্যসাচীকে জেল হাসপাতালে রাখা হয়েছে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করতে লাগলো সে। কিন্তু তার হাতপাতালে যাবার অনুমতি নেই।

পরদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে এসে পৌছালো রফিক। তাকে ও ঠেলে দিল রতনলালের সেলে। অদ্ভুত চেহারা হয়েছে রফিকের। মাথার চুলগুলো শক্ত হয়ে আছে। মুখে আর হাতে ও কালো কালো ছাপ।

রতনলাল বললো, এ কি করে হলো?

রফিক বললো, দৌড়াবর সময় ধাক্কা লেগে একটা আলকাতর ড্রাম উল্টে গিয়েছিল, তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম।

-কখন?

কাল।

-তারপর ব্যাটারা ধরার পর ধোওয়ার ব্যবস্থা করে নি?

-আলকাতরা ওঠাতে অনেক তেল লাগে। অতখানি তেল কি আর খরচ করবে। তবে, আমাকে এই চেহারায় একবার কোর্টে নিয়ে যা না! জজ সাহেবকে বলবো–

-তুই জানিস তো, অরিন্দম সব বলে দিয়েছে।

-শেষে পর্যন্ত অরিন্দম? নিজের চোখে দেখলেও যেন বিশ্বাস হয় না। সব মামলাতেই দেখেছি, একজন না একজন রাজসাক্ষী হবেই। পুলিশরা কি কায়দা জানে বলো তো?

-মার সহ্য করতে পারে না সকলে। রেডি থাকিস, আমাদের মার খাওয়ার পালা আসেনি এখানো।

-আমাদের মারবে কেন? ধরেই তো ফেললো।

-অরিন্দম কতটা বলছে তার ঠিক কি? আমাদের অ্যাকশানের কথা– পুলিশ টাকাগুলো বার করার চেষ্টা করবে-আরও কে কে দলে আছে-পুলিশ তো কিছুতেই খুশী হয় না!

পরদিনই রফিককে রতনলালের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। তাকে রাখা হলো জেলের একেবারে অন্য প্রান্তে। রফিকের সঙ্গে দেখা করতে এলো ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কয়েকজন মুসলমান অফিসার। তারা রফিককে এই রকম মিথ্যে আশ্বাস দিল যে, রফিক যদি অন্যদের সব কথা বলে দেয়, তা হলেই তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হবে। শুদু শুধু সে কেন নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়াচ্ছে।

রফিক সবচেয়ে মিষ্টভাষী পুলিশ অফিসার টিকে বললো, আপনি তো আমার খুব শুভাকাঙ্খী, আপনি আমার উপকার করবেন?

পুলিশ অফিসারটি সাগ্রহে বললো, কি বলুন?

-আমার প্রথম ডিক্লারেশানে কয়েকটা কথা বাদ পড়ে গেছে সেগুলো যোগ করে দেবেন?

-হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

-তখন একটা কথা বলতে আমি ভুলে গেছি। ট্রেন ডাকাতির সময় সেই নেপালী ভদ্রলোককে আমি খুন করেছি।

ইন্সপেক্টর বললেন, তাই নাকি? হাই ইন্টারেস্টিং আপনার বন্ধুও যে সেই কথাই বললেন।

-আমার কোন বন্ধু?

-রতনবাবু। উনি বললেন, নেপালীটিকে উনিই খুন করেছেন আপনি তখন সেখানে ছিলেনই না।

-রতন ঠিক বলে নি। আর রতন আমার বন্ধুও নয়। ও অযোগ্য, সব সময় ভয় পেত, কোনো কাজ নিজে অংশ গ্রহণ করতে চায় নি–এই ট্রেনের অ্যাকশানেওর কোনো দায়িত্বই ছিল না।

-হুঁ! আর উনি বলছেন, উনিই নাকি সব কিছু পরিকল্পনা করেছিলেন। ঐলোকটিকে আপনারা যে রকম মনে করেন, সে রকম কিন্তু নয় একটুও। অসম্ভব ধূর্ত। আপনাদের সবাইকে জড়াতে চাইছে। আপনাদের নামে এমন সব কথা বলেছে–

রফিক তাকে বাঁধা দিয়ে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললো, আপনাদের ঐ কায়দা খুব জানা আছে আমাদের। আমাকে এসে বলবেন রতনলালকে বিশ্বাসঘাতক, সে সব ফাঁস করে দিয়েছে। আর রতনলালকে গিয়ে বললেন, আমি বিশ্বাসঘাতক, আমি সব ফাঁস করে দিয়েছি। আপনি মুসলমান বলে আমার কাছে এসেছেন, আর ওর কাছ পাঠানো হবে হিন্দু অফিসারদের। তাই না? এরকমভাবে আগে অনেককে ধোঁকা দিতে পেরেছেন, আমাদের পারবেন না।

রতনলালের ওপরেও প্রথম দিকে তেমন কোনো অত্যাচার করা হলো না। তবে দিনের পর দিন সাত আট জন লোক তাকে ঘিরে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে হাজার রকম প্রশ্ন করে যায়। তারা প্রথমত জানতে চায়, টাকাগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে আর, সারা দেশের আর কোন বড়বড় নামকরা লোক এর সঙ্গে জড়িত আছে। নিশ্চয়ই সে রকম কেউ কেউ আছে। একমাত্র সব্যসাচী ছাড়া পুলিশের চোখে আর সবাই নতুন আসামী।

রতনলাল একটা কথারও উত্তর দেয় না। সে শুধু বলে সে পুলিশের কাছে কোনো ষ্টেটমেন্ট দেবেনা। যা বলার আদালতে বলবে। তবু একই প্রশ্ন বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করে পুলিশ ওর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিতে চায়। কিন্তু রতনলাল চুপ করে বসে থাকে। সে রফিকের মতন হাস্য পরিহাসও করে না।

এরপর হঠাৎ শুরু হয় তার ওপর নানা ধরনের অত্যাচার। পর পর দুদিন তাকে খাবার দিতে ভুলে গেল জেল কর্তৃপক্ষ। তৃতীয় দিনে কয়েকজন পুলিশ এক গাদা ভালো ভালো খাবার নিয়ে এসে খুব ক্ষমা-টমা চাইলো। তারা বার বার বললো, এটা অন্যায় হয়ে গেছে। যাই হোক, পুলিশের সঙ্গে একটু সহযোগিতা করলেই তো তাকেও এ ক্লাসে প্রিনার করে রাখা হবে। তখন যা খুশি তাই খেতে পারবে। শুধু একবার বলে দিন, অমুক অমুক নেতা আপনাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন কিনা!

রতনলাল বললো, কেন মিছিমিছি আমাকে বিরক্ত করছেন। আমি ট্রেন ডাকাতি করেছি, একটা লোককে মেরেছি, টাকাগুলো নষ্ট করেছি-এ সবই তো আপনারা জানেন। এখন আমাকে আন্দামানে পাঠান বা ফাঁসি দিন, যা খুঁশি করুন। আমি আর অন্য কিছু জানি না!

এরপর পুরো দু'ঘন্টা রতনলালকে হাতে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হলো। মাঝে মাঝে তার হাঁটুতে রুলের গুঁতো মেরে এক একজন প্রশ্ন করে, কি কিছু বলবি, হারমীর বাচ্চা?

রতনলাল যেন একটা পাথর। এত মারধোর, অত্যাচারেও তার মুখ দিয়ে একটা কথা বার করা যায় না। পুলিশ অফিসারদের দিকে সে অবজ্ঞার চোখে তাকায়। যেন তার চোখে ওরা মানুষ বলে গণ্য করার মতনও কিছু নয়।

রাত্তিরবেলা যখন সে একা থাকে, তখনই তার মুখটা খুব বিষণ্ন হয়ে যায়। সে আপন মনে বিড়বিড় করে একা কথা বলে। রতনের মনের মধ্যে শুধু এই গ্লানি যে, তারা সার্থক হতে পারলো না। ট্রেন ডাকাতির এতগুলো টাকা, এতগুলো ছেলের প্রাণ-কিছুই তো কাজে লাগানো গেল না। দলপতি হিসাবে এই ব্যর্থতার বিরাট বোঝা শুধু যেন একা একা তাঁ কাঁধেই চেপে বসেছে।

এদিকে বিভিন্ন সংবাদপত্র রতনলালদের নিয়ে খুব হৈ-চৈ করা হচ্ছে। ছাপা হয়েছে তাদের ছবি। জেলখানায় তাদের ওপর অত্যাচারে বিবরণ কি করে বেরিয়ে এলো বাইরে, দেশি সংবাদপত্রগুলো তাই নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো সরকারকে। আর সাহেবী কাগজগুলো প্রশ্ন করলো, গত পাঁচ ছ'বছর তো সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ ছিল, আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো কি করে? এর পেছনে কি কংগ্রেসীদের হাত আছে? মিঃ গান্ধী কোনো কথা বলছেন না কেন?

মহাত্মা গান্ধী অবিলম্বেই বিবৃতি দিলেন, দেশের জন্য যারা কাজ করতে এসেছে, তিনি তাদের সকলকেই ভালোবাসেন। তবে হিংসামূলক কার্যকলাপ তিনি কোনোদিনই সমর্থন করবেন না।

কলকাতার নাগরিকদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হলো এদের মামলা চালাবার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। কয়েকজন উকিল ব্যারিষ্টার আসতে লাগলেন জেলে। তার ফলে, জেলখানায় এদের থাকার ব্যবস্থার উন্নতি হলো, শারীরিক অত্যাচার কমলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে সরকার ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হতে লাগলো এদের কঠোর শাস্তি দেবার। যাতে সন্ত্রাসবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার আগেই সমূলে বিনষ্ট হয়।

রতনলালকে একদিন জানানো হলো ভিজিটিং আওয়ার্সে একজন স্ত্রীলোক তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। নাম, সুশীলাবালা দাসী।

রতনলাল রীতিমতো অবাক হয়ে গেল। এ নামের কারুকে সে চেনে না। আলাদাভাবে দেখা করতে আসবে, এরকম কোনো মহিলার সঙ্গে ও তার আলাপ নেই। পাটনা থেকে তার বাবা ও বড়দি এসে গত সপ্তাহে একবার দেখা করে গেছেন।

রতনলাল সেখানে গিয়ে দেখলো মাথায় ঘোমটা দেওয়ার একজন মহিলা। মুখ তুলে তাকাতেই চমকে উঠলো।

আসানসোলের সেই বস্তির ভানুমতী। সিঁতিতে সিঁদুর, কপালে টিপ আর লাল পড়ে শাড়ী পরে অন্যরকম সেজে এসেছে-যাতে তাকে কেউ বারবনিতা বলে চিনতে না পাবে।

ভানমতী কোনো কথা বলার আগেই রতনলাল তাকে চোখে ইশারা করলো সাবধান হতে। একজন শান্ত্রী পাশেই দাঁড়িয়ে। পাঠান শান্ত্রী হয়তো বাংলা বোঝে না, তবু বিশ্বাস করা যায় না। তাছাড়া ভানুমতীর ওপর পুলিশের নজর পড়বে এবারে-ওকে অনুসরণ করবে। বাড়িঘর সার্চও করতে পারে। এটা বেফাঁস কথা বললেই বিপদ।

ভানুমতী বললো, তোমাকে আমরা চিনতে পারিনি, কত রকম আজে- বাজে কথা বলেছি। তাই পায়ের ধুলো নিতে এলাম।

রতনলাল বললো, তুমি যে এসেছো, আমি খুব খুশী হয়েছি। হয়তো আর কোনোদিন দেখা হতো না।

-আমাকে তুমি কি বিপদেই যে ফেলে গেছ। আমার একটুও ঘুম হয় না, সব সময় কাঁটা হয়ে থাকি।

রতনলাল ঠোঁটের ইশারায় বললো, চুপ করো।

ভানুমতী তবু থামলো না। বললো, তোমার ছেলেকে আমি কি করে মানুষ করবো? আমার সহায় সম্বল নেই, থাকবার জায়গা নেই-আমি তাকে নিয়ে কি করি!

রতনলাল বড় রকমের একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। ভানুমতীকে দেখে যাই মনে হোক, তার বুদ্ধি আছে। টাকার কথাটা সে বলে ফেলে নি

অদ্ভুত ধরনের কৃতজ্ঞতা বোধ করলো রতনলাল।

অতগুলো টাকা নিয়ে ভানুমতী যদি আসানসোলের সেই বস্তি থেকে একবার সরে পড়তো- কোনোদিন আর তার খোঁজ পাওয়া যেত না। ওর যে রকম দুঃখের জীবন, তাকে টাকাগুলোর লোভ সংবরণ করতে যদি নাও পারতো, তবু খুব একটা দোষ দেওয়া যেত না। কত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সে এসেছে।

রতনলাল বললো, ছেলে তোমার কাছেই থাক। পরে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

ভানুমতী বললো, না, না সেও কি হয়। তোমার ছেলে, আমার কাছে থাকলে তার কত অযত্ন হবে আমি সারাক্ষণ তাকে চোখে রাখতে পারবো?

রতনলাল একবার শান্ত্রীর দিকে তাকালো। মুখ দেখলে মনে হয় নিরেট মুর্খ। কি জানি, সে কি ভাবছে।

রতনলাল বললো, তুমিই পারবে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমার ছেলে তোমার কাছেই থাক!

ভানুমতি ব্যাকুলভাবে বললো, আমি যে নিজেই বিশ্বাস রাখতে পারি না কখন কি হয়ে যায়। তোমার কোনে আত্মীয়-বন্ধু নেই, তার কাছেই ওকে পাঠিয়ে দিতাম। যেমন করে হোক, আমি ঠিক পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবো।

রতনলাল দ্রুত চিন্তা করতে লাগলো। টাকাটা সে কার কাছে পাঠাতে বলবে? তার দলের প্রায় সকলেই ধরা পড়েছে। যারা ধরা পড়েনি, তাদের ঠিকানাই বা জানবে কি করে? কয়েকজন যে শুভানুধ্যায়ী আছে, তাদের ওপরেও পুলিশের নজর পড়তে পারে। অন্য কোনো বিপ্লবী দলেরও এই টাকা পেলে অনেক কাজে লাগতো। কিন্তু সবাইকে কি বিশ্বাস করায় যায়? ঠিকানাই বা জানবার উপায় কি? কাগজে কিছু লিখে দেবার উপায় নেই।

দেখা করার সময় এক্ষুণি শেষ হয়ে যাবে এর মধ্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। টাকাটা যেন গভর্ণমেন্টের হাতে কিছুতেই না পড়ে।

রতনলাল বললো, নিজের কাছে না রাখতে পারো, তাহলে ছেলেকে গান্ধীজীর আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে পারবে? সবরমতীতে ওনার আশ্রম।

ভানুমতী বললো, পারবো।

তারপর ভানুমতী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমাকে যে কি পরীক্ষায় ফেলেছিলে! আমি দিনরাত ঠাকুরকে ডাকতাম, ঠাকুর আমাকে রক্ষা করো। ছেলেটা যদি হঠাৎ চুরি হয়ে যায়, তাহলেও তো কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে না। তখন ঐ দেবতুল্য লোকটাকে আমি কি কৈফিয়ৎ দেবো?

রতনলালের ইচ্ছে হলো, ভানুমতীর পায়ের ধুলো নিতে কিন্তু তা সম্ভব নয়। সে মনে মনে বললো, আমার জীবনের যদি কিছু পুণ্যফল থাকে-তা হলে তার সবটুকুই আমি এই দুঃখিনী স্ত্রীলোকটিকে দিলাম।

বিদায় নেবার সময় সে ভানুমতীকে মুখে শুধু বললো, যদি বেঁচে থাকি, আবার দেখা হবে।

আদালতে মামলা ওঠার সময় রতনলালের সঙ্গে রফিক, সব্যসাচী, নিরঞ্জন প্রভৃতির দেখা হলো। অরিন্দমকে সেখানে না দেখে ওরা একটু অবাক হয়েছিল। সরকারী পক্ষের সাক্ষী হিসাবেও অরিন্দমকে আনা হচ্ছে না। কয়েকদিন পরেই জানাজানি হয়ে গেল, অরিন্দম আত্মহত্যা করেছে। শেষের দিকে অরিন্দমের মাথার গোলমাল দেখা দেয়- লালবাজারের তিনতলা থেকে লাফিয়ে পড়েছে।

সব্যসাচীর হাতে এবং কাঁধে এখনও বিরাট ব্যাণ্ডেজ। কিন্তু তার মুখখানা বেশ উৎফুল্ল। আদালতে সে চেঁচামেচি করে আর মুহুর্মুহু মাতরম ধ্বনি দেয়।

রতনলালকে সে জিজ্ঞেস করে, কি রে মুখ শুকনো করে আছিস কেন? এখনই তো আনন্দ করার সময়। আর তো চিন্তা-ভাবনা করার কিছু নেই।

রতনলাল বললো, সেজন্য নয়। আমাদের সব কিছু ব্যর্থ হয়ে গেল।

সব্যসাচী বললো কেন, ব্যর্থ হবে কেন, আমাদের যেটুকু সাধ্য আমরা করেছি।

-কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আমরা ট্রেনের অ্যাকশানটা করলাম-তার কিছুই হলো না। টাকাটা পর্যন্ত কাজে লাগানো গেল না।

কিন্তু আমাদের জীবনটা তো কাজে লাগিয়েছি। আমাদের যদি ফাঁসিও হয়, তাতে ও দুঃখ নেই, এক ক্ষুদিরাম ফাঁসি চড়ে কতগুলো বিপ্লবীর জন্ম দিয়ে গেছে।

রফিক কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললো, রতনদা। তুমি দুঃখ করো না। সুকুমারকে আমরা পাঠাতে পেরেছি। আমাদের কিছুটা উদ্দেশ্য ওখানেই সিদ্ধি হয়েছে, সুকুমার ধরা পড়ে নি, সে খাঁটি ছেলে-সে আমাদের বিপ্লবের কাজ বয়ে নিয়ে যাবে।

রতনালালের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেলো। সে বললো, ঠিক। সুকুমার এখনো আছে। সে আমাদের সকলের প্রতিনিধি হয়ে রইলো।

সব্যসাচী বললো, আমার আর কি মনে হয় জানিস? আদালতে আমাদের সবার সব ঘটনা খুলে বলা উচিত। আমাদের বিবৃতির যেটুকু কাগজে ছাপা-হবে তাতেই অন্যরা বুঝতে পারবে আমরা কি করতে চেয়েছিলাম। এরা আমাদের সারারণ ডাকাত সাজতে চাইছে।

রফিক বললো, আমারও তাই মত।

রতনলাল বললো, আমিও এতে রাজী।

তারপর আদালত তারা বেপরোয়া হৈ-হল্লায় মাতিয়ে রাখে। জজের কোনো নির্দেশ মানে না। পুলিশের ব্যাটনের ঘা খেয়েও গানস জুড়ে দেয়।

জেলখানাতে ও এরা এখন আর নিঃশব্দ থাকে না। সকলকে বিভিন্ন সেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু পরস্পরকে জান দেবার জন্য একজন বন্দে মাতরম চেঁচিয়ে উঠলেই অন্যরা সাড়া দেয়। সব্যসাচী গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, রতন, রফিক, নিরঞ্জন, বাবুল-বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, তোরা শব্দ শুনতে পাচ্ছিস? মাইরি,আজ মুড়ি আর তেলেভাজা পেলে যা জমতো ন! গভীর রত্রে হঠাৎ সব্যসাচী সেল থেকে গান ভেসে আসে।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগৎ-জনের শ্রবণে জুড়াক
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক
মুখ তুলে আজি চাই রে। ---
আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে
--- আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে
সব পাপ তাপ দূরে যাবে চলে
পূণ্য প্রেমের বাতাসে----

রতনলালের গলায় সুর নেই, তবু উঠে সেও গুণগুণ করে গলা মেলায়। রফিক লোহার গরাদ ধরে শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে।

অন্যরা একজন আলাদা সেলে থাকলেও রফিকের ঘর আর একজনকে রাখা হয়েছে। লোকটা সাধারণ অপরাধী কিংবা বা পুলিশের স্পাই। এখনো বোধ হয় পুলিশের আশা আছে, রফিক সরকারের দয়া চেয়ে আরও অনেক কথা ফাঁস করে দেবে।

রফিকের বহু আত্মীয়-স্বজন এসে এর মধ্যে তাকে বোজবার অনেক চেষ্টা করছে। রফিকের চাচাজীকে ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের এক বড় কর্তা রায় বাহাদুর আশ্বাস দিয়েছে যে রফিক রাজসক্ষী হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। রফিক কর্ণপাত করেনি।

শেষ পর্যন্ত রতনলাল, রফিক আর সব্যসাচী তিনজনের ফাঁসির দণ্ড হয়ে গেল। এত কঠোর দণ্ডদেশের কোনো লোকই আশা করেনি। সারা দেশে দারুণ একটা উত্তেজনা দেখা ছিল। মহাত্মা গান্ধী ভাইসরয়কে অনুরোধ করলেন, দণ্ড পুনর্বিবেচনা করার জন্য। এই বিপ্লবীদের সমর্থনে কলকাতায় একটি মিছিল পরিচালনা করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র কারাবরণ করলেন।

বিপ্লবীর কেউই আপীল করলো না।

রফিকের চাচাজী আজ এসে বিষম পেড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তিনি পাকা খবর নিয়ে এসেছেন, আপীল করলেই মৃত্যদণ্ড হ্রাস হয়ে কয়েক বছরের মাত্র জেল হবে।

রফিক বললো, না।

চাচাজী বললেন, কেন বাছা, তুই এরকম জেদ করছিস কেন?

রফিক উত্তর দিল, চাচাজী আপনার বড় ভাইয়ের যখন ক্যান্সার হয়েছিল, তখন সবাই জানতো তিনি কয়েক মাস পরেই মারা যাবেন। তখন কার কাছে আপীল করেছিলাম? বৃটিশ সরকারের কাছে?

রফিকের ভয় ছিল তিশ্না নিশ্চয়ই দেখা করতে এসে খুব কান্নাকাটি করবে। তাহলে রফিকের মন দুর্বল হয়ে যেত বোধ হয় একটু। কিন্তু তিশ্না একদিনও আসেনি নিশ্চয়ই তার বাড়ির লোকসব জানতে পেরে খুব ভয় পেয়ে গেছে। হয়তো তিশ্নাকে সরিয়ে দিয়েছে কলকাতার বাইরে।

কুন্তলা একদিন দেখা করতে এলো সব্যসাচীর সঙ্গে। পুলিশ রমেশবাবু, কুন্তলা মেজদি তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল। রমেশবাবুকে এখানে আটক রেখেছে-বাকী দু'জন জামিনে ছাড়া পেয়েছে।

কুন্তলা এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনার হাতের ব্যথা কি রকম? একটু কমে নি?

সব্যসাচী হেসে বললো, এ ব্যথাটা আর এ জীবনে কমবে না।

কুন্তলা পরের দু'এক মিনিট কোনো কথা বলতে পারলো না। এই দু'দিনে অনেক রোগা হয়ে গেছে সে। অনেকটা তপস্বিনীর মতন দেখায় তাকে।

সব্যসাচী বললো, তোমাদের বিশেষ কিছু শাস্তি দেবে না বোধ। হয় এবার তোমাদের ছেড়ে দেবে।

কুন্তলা সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললো, আপনাদের এখানে পড়বার বই-টই দেয়। কিছু লাগবে আপনার?

-না, বই-টই পাওয়া যায়।

-কিছু পেতে ইচ্ছে করে আপনার।

হ্যাঁ তোমাকে পেতে চাই।

কুন্তলা মুখ নীচু করলো। সব্যসাচী বললো, বিপ্লবী হিসাবে হয়তো ছোট হয়ে গেছি, শুধু দেশমাতৃকার চিন্তা নিয়ে মরতে পারলাম না। আমর দুটো দুঃখ বয়ে গেল। আমি দেশের জন্য আরও কিছু করতে পারলাম না। আর তোমাকে, পেলাম না। শুধু তোমার জন্য আমি দেশকে ছাড়তে পারতাম না। আবার দেশের জন্যও তোমার কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। আমি অর্ধেক বিপ্লবী -এই সত্যি কথাটা তোমাকে শুনিয়ে যাচ্ছি।

-না, একথা ঠিক নয়। আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের একজন।

সব্যসাচী একটু হেসে বললো, দু'দিন বাদে মরতে যাচ্ছি। এখন তো মিথ্যে বলে লাভ নেই। দেশকে যতখানি ভালোবাসি, তোমাকে তার চেয়ে একটু কম ভালোবাসি নি। পরাধীনতার জন্য আমার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলেছিল। এখন বুঝতে পারি, তুমিও আমার মধ্যে এক সাংঘাতিক আগুন জ্বালিয়েছিলে। এট বোধ হয় খাঁটি বিপ্লবীর ধর্ম নয়। তবু একথাটা স্বীকার করে যাই।

কুন্তলা মৃদু গলায় বললো, আমি পরজন্মে বিশ্বাস করি। আমি জানি, পর জন্মে ঠিক আবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

সব্যসাচী বললো, ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করে থাকবো।

দেশের লোকের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কিছুই গ্রাহ্য করলে না সরকার। ওদের ফাঁসির তারিখর নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

সাধারণত ভোরবেলাই ফাঁসি দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু ওদের সেই চরম মুহূর্তে এলো রাত বারোটায়। রাতারাতিই মৃতদেহগুলি দূরে সরিয়ে ফেলার ইচ্ছে।

সব্যসাচী বই পড়ছিল। দরজা খোলর শব্দ হতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে বললে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন, আমি নিজেই যাচ্ছি।

রফিককে জেল থেকে বার করার পর সে জেল অফিসারকে বললো, আপনার কাছে চিরনি আছে? পকেটে চিরুনি নেই?

-না তো চিরুনি মানে–

-হ্যাঁ, একটা চিরুনি এনে দিন না! শাদী করতে যাচ্ছি, একটু সেজে গুজে যেতে হবে না? এক বছর পর আমার শাদী করার কথা ছিল, একটু আগে আগেই হয়ে যাচ্ছি।

জেল অফিসার অন্য দিকে মুখ লুকোলো।

একমাত্র রতনলালই অত শান্তভাবে মরতে গেল না। শাস্ত্রীদের পায়ের আওয়াজ চেয়েই সে চেঁচিয়ে উঠলো, বন্দে মাতরম।

সে চিৎকার এমনই প্রচণ্ড যে, গরম কেঁপে উঠলো সার জেলখানা। প্রত্যেকটা বন্দী জেগে উঠলো সেই শব্দে।

রতনলাল আর একবার সেই ধ্বনি দিতে অন্য কুঠুরি থেকে প্রতিধ্বনি ভেসে এসো।

ইউরোপীয় জেল সুপারিটেণ্ডন্ট ধমক দিল, কিপ ই মাউথ শাট।

রতনলাল তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো, আরও কিছু শাস্তির ভয় দেখাবে নাকি? বেশ করবো, বললো।

রতনলাল আবার চিৎকার করলো, বন্ধে মাতরম।

সারা জেল থেকে তার উত্তর পাওয়া গেল। সাধারণ কয়েদীরা মন্ত্রমুগ্ধের মতন এই ধ্বনিতে গলা মেলাচ্ছে।

রতনলালকে কচুপ করার জন্য ব্যাটন দিয়ে প্রচণ্ড এক ঘা মারা হলো তার মাথায়। সে মাটিতে পড়ে গেল, সেইখান থেকেই আবার সে চেঁচিয়ে উঠলো।

মিটিন দশেক ধরে রতনলালকে মারধোর করা চললো। টেনে হিঁচড়েও তাকে আনা যায় না। সে যেন এক মিছিল পরিচালনা করছে। শ্লোগানে সে জেল ভরিয়ে দিচ্ছে। তার মুখ দিয়ে তখন ভলকে রক্ত বেরচ্ছে এক সঙ্গে তিন চারজনে মিলে রতনলালকে এক সময় চুপ করিয়ে দিল। মাটি থেকে আবার টেনে হিচড়ে যখন তাকে তোলা হলো, তখন সে অজ্ঞান হয়ে গেছে না একেবারেই মরে গেছে, তা বোঝার উপায় নেই। সে সজ্ঞানে ফাঁসির দড়ি গলায় পরলো না অন্তত। সেই অবস্থায় হঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে আসা হলো তাকে।

ফাঁসির মঞ্চের কাছে সব্যসাচীই আগে পৌছে গেছে। তর বন্ধুরাও তখন আসে নি বলে সময় কাটাবার জন্য সেস তার কাঁধের বাণ্ডেজটা খুলে ফেলতে লাগলো একহাত দিয়ে। তার তো ব্যাণ্ডেজটা রাখার দরকার নেই।

ব্যাণ্ডেজটা সব খুলে ফেলে সে সস্নেহে তার ক্ষত-স্থানটার দিকে তাকালো। ইঞ্জিন ড্রাইভারটা একটা মোক্ষম ঘা দিয়েছিল বটে। সেই লোকটা এখনো বোধ হয় কোনো রাতের ট্রেন চালাচ্ছে, এই খবরটা জানতে পারলে লোকটা বোধ হয় খুশীই হবে।

কুন্তলা বলেছিল, পরজন্মে দেখা হবে। পরজন্ম বলে কি সত্যি কিছু আছে? মাথার ওপরে ঐ যে বিরাট আকাশ, ওটা কি শুধুই শূন্যতা না এক রহস্যের যবনিকা।

যাক, সুকুমার ধরা পড়েনি। আমাদের সকলের বাসনর প্রতীক হয়ে রইলো সুকুমার। সুকুমার, এই দেশটার দুর্দশা দুর করিস। একদিন যেন এই দেশ জগৎ সভায় আবার শ্রেষ্ঠ আসন নেয়। এখানে যেন কোনো মানুষের দুঃক থাকে না। আমরা পারলাম না। তুই পারিবি, ঠিক পারবি।

এই সময় কুন্তলার মুখটা মনে পড়ে গেল তার। কুন্তলা ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সব্যসাচী একটু অবাক হলো। দেশের জন্য সে প্রাণ দিতে যাচ্ছে, এখন শুধু দেশের কথাই তো চিন্তা করা উচিত ছিল তার। তবু একটি নারীর মুখ এসে দেশকেও আড়াল করে দিচ্ছে কেন? অন্যান বিপ্লবীদের কি এরকম হয়?

পুকুরের ধারে বসে জলের আয়নার নিজের মুখ দেখা-যে জীবন, তা আজ কত দূরে। তবু চিরকার ঐ ছবিটা থেকে যাবে।

রতনলালকে আনতে দেখে সব্যসাচী বললো, রতন, একবার কোলাকুরি করি।

রতনলাল কোনো সাড়া দিল না। সব্যসাচী তাকে ভালো করে দেখে একবার শিউরে উঠলো। তারপর ব্যাঙ্গ সুরে জেল অফিসারকে বললো, একে আগেই মেরে নিয়ে এসেছেন? কাজ এগিয়ে রাখছেন বুঝি?

এবার রফিক এসে পৌছালো। সে দৌড়ে এস জড়িয়ে ধরলো সব্যসাচীকে। সব্যসাচী যন্ত্রনায় চেঁচিয়ে বললো- উ, উ, উঃ! তুই আমার ব্যথার জায়গায়–

অপ্রস্তুত হয়ে রফিক ছেড়ে দিল তাড়াতাড়ি যন্ত্রণায় সব্যসাচীর চোখে জল এসে গেছে। তবু সেই অবস্থায় সে হেসে বললো, এখনো হাতের ব্যথার জন্য কি রকম চেঁচিয়ে উঠলুম! জীবনটা এই রকমই, না রে?

তারপর সে রফিকের কাঁধে সুস্থ হাতটা রেখে বললো, চল।

দুই বন্ধু নির্ভীকভাবে উঠে গেল ফাঁসির মঞ্চে।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—